ঝড় ও ঝরা পাতা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

এক

কায়স্থের ছেলে। পূর্ব্বপুরুষের “তি[illegible] মধ্যে কোন রাজারাজড়ার কাহিনী প্রচা[illegible] [illegible] রায় চৌধুরী কিম্বা শুধু রায় কি শুধু চৌধুরীদের [illegible] শুধু মিত্র; আছে শুধু “ঘোষ বোস মিত্র কুলের [illegible]ধিকারী” প্রবাদ অনুযায়ী কুলগৌরব। সুতরাং এককালে নিঃসংশয়ে উচ্চ মধ্যবিত্ত ছিল—বর্ত্তমানে কোন্ শ্রেণীতে পড়বে সে কথা বিবেচনা-সাপেক্ষ। যুদ্ধের আগে পর্য্যন্ত নিম্নমধ্যবিত্ত ছিল—বর্ত্তমানে বিত্ত নিঃশেষিত। জীবিকায় ‘দিন আনে দিন খায়’ নয়, বাঁধা মাইনের বাবু পদবীর চাকুরে—কিন্তু দিন আনার ব্যবস্থা না করলে দিন যায় না। আপিসের দারোয়ানদের কাছে ধার করে মাসের মাইনে থেকে সুদ সমেত টাকা শোধ করে। কাবুলীর কাছে ধার করে মধ্যে মধ্যে, তারা দু’-তিনজন মিলে পাড়ার গলির

মুখে ব'সে থাকে ; দারোয়ানের দেনা শোধের পর উদ্‌বৃত্ত থেকে তাদের টাকা দিয়ে বাড়ী ফিরে আসে নিঃশেষিতবিত্ত হয়ে। তবু চালে চলনে প্রাণপণে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রত্যন্ত সীমার শেষ খুঁটাটি কোন রকমে আঁকড়ে ধরে আছে। সংসারের সংস্থানে বিত্ত নিঃশেষিত—অন্তরের মধ্যে চিত্তও অসার। ছেলে-গুলো যে ভবিষ্যতে লেখাপড়া শিখে বড় মানুষ হয়ে দুঃখ ঘুচাবে, এ কল্পনাটুকু করবারও শক্তি অথবা প্রবৃত্তি নাই। নিজে পড়েছিল ম্যাট্রিকুলেশন থার্ড ক্লাশ পর্য্যন্ত—সে অনেক দিনের কথা—তখনও ক্লাশ গণনা—নীচে থেকে গুণে থার্ড ক্লাসকে 'ক্লাস এইট' বলত না। বর্ত্তমানে সেকালের পড়া খান কয়েক বইয়ের নাম মাত্র মনে আছে,—তার মধ্যে প্রথম ও প্রধান হচ্ছে ব্যাকরণ-কৌমুদী—মলাটে তার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ছবি ছাপা ছিল—ইংরেজী ব্লাকী এ্যাণ্ড স্মিথস্ রীডার; ভিতরের বস্তুর মনে থাকবার মধ্যে আছে—নরঃ নরৌ নরাঃ—আর টেল মি নট্ ইন্ মোর্ণফুল নাম্বারস্ লাইফ ইজ বাট এ্যান এম্পটি ড্রীমের একটা প্যারাগ্রাফ মাত্র। বাংলা বইগুলোর নাম মনে নাই, তবে গল্প-টল্প—জীবনীকথা দু'-চারটে মনে আছে। ছেলেগুলো পথে মারামারি করে, গুলি খেলে, স্কিপিং করে অনবরত নাচে, ধূলো মাখে, অশ্লীল গাল দেয় পরস্পরকে—তাও মনে বিশেষ কোন সাড়া জাগায় না। চেয়ার-টেবিলে বসে চাকরী নয়; খিদিরপুর থেকে হাওড়ার পোল পর্য্যন্ত শেডে ইয়ার্ডে জেটীতে ঘুরতে হয়; একস্‌পোর্ট ইম্পোর্টার কোম্পানীর সরকার বাবু—মাল-খালাস মাল-বোঝাইয়ের তদারক এবং হিসেব রাখা কাজ; দাঁড়িয়ে রোদে জলে পুড়ে ভিজে কাজ দেখে মধ্যে মধ্যে আপিসে এসে রেকর্ড ডিপার্টমেণ্টের প্রকাণ্ড বড় টেবিলের সামনে একখানা হাতল-

ভাঙা চেয়ার টেনে বসে রিপোর্ট লিখে দাখিল করে। বড় বাবুর টেবিলের সামনে দাঁড়ায়, কৈফিয়ৎ দেয়—বড় বাবু তিরস্কার করেন, ইংরেজ বড় সাহেব তিরস্কারের ধার ধারেন না—সোজা বলেন— ইডিয়ট, ননসেন্স, রাস্কেল; গোপেন মাথা নীচু ক'রে—লজ্জায় বা দুঃখে কিম্বা ভয়েও নয়; মাথা উঁচু করে শুনলে বড় বাবু বা বড় সাহেব বেশী চটে যাবে ব'লে মাথা নীচু করে সে। কামরা থেকে বেরিয়ে এসে ময়লা দুর্গন্ধযুক্ত রুমালে কপাল এবং মুখের ঘাম মুছে নিয়ে বলে—শালা! কাকে বলে সে, অর্থাৎ গালাগালিটা বড় বাবুকে বা বড় সাহেবকে অথবা যে দুঃসময়টা গেল তাকে কিম্বা নিজের ভাগ্যকে কি সবগুলোকে জড়িয়ে সকলকেই দেয় কিম্বা কাউকেই না দিয়ে শুধু অভ্যাস বশতই বলে, সে-কথা সে নিজেও জানে না। এর পরই সে বিড়ির তৃষ্ণা অনুভব করে, জল খেয়ে, টাইপরাইটারের রিবনের কৌটা—যেটাকে সে বিড়ি-কেস হিসেবে ব্যবহার করে—সেইটা বের করে প্রথমে ঢাকনার উপর একটা আঙুলের টোকা দেয়—তার পর সেটাকে খুলে টিপে-টিপে দেখে একটি নিটোল বিড়ি বেছে নিয়ে দুমুখে ফুঁ দিয়ে মুখে পূরে ধরিয়ে উঁচু দিকে মুখ তুলে ধোঁয়া ছেড়ে দেয়। বাড়ীতে ফিরে কোন দিন ছেলেগুলোকে প্রহার করে—কোন দিন স্ত্রীর সঙ্গে কলহ করে, মধ্যে মধ্যে স্ত্রীর কান্নাও শোনা যায়। সম্ভবত প্রহারও করে। কোন দিন সকালে গিয়ে ফেরে তিনটে চারটেয়, কোন দিন বেলা এগারটায় বেরিয়ে রাত্রি ন'টায়। চাকরীর সর্ব্বাপেক্ষা মনোহারী অংশটুকু হল ট্রামে যাওয়া-আসা, কোম্পানী ওকে একখানা শ্যামবাজার সেক্‌সনের মান্থলী টিকিট দিয়েছে, কোম্পানীর কাছে মাইনের কৃতজ্ঞতার চেয়েও এই কৃতজ্ঞতাটাই অনেক বেশী। বিশেষ ক'রে রাত্রে ফেরার সময় ট্রামের ফার্ষ্ট ক্লাসে বসে দু'ধারে আলোকোজ্জল

দোকানদানীর দিকে অলস দৃষ্টিতে চেয়ে ফেরাটা একটা বিলাস। ন'টার পর ট্রামের ভিড়ও কম হয়ে আসে। দু'-একদিন ভিড় হয় কিন্তু গোপেনের সব চেয়ে বড় সুবিধে সে ওঠে ডালহৌসি অথবা এসপ্লানেডে একেবারে ছাড়ার জায়গা হ'তে। ষ্ট্রাণ্ড রোড হেঁটে এইটুকু এসে সে খালি গাড়ীর সিটে জানালার ধার ঘেঁসে বসে। সিটের মধ্যে তার আবার বাছাই করা সিট আছে। নতুন ট্রামে সে বসতে চেষ্টা করে—দরজার পাশেই লেডি সিটের পিছনের সিংগল সিটটিতে। যে ট্রামে একেবারে সামনে গাড়ীর পিছনের দিকে মুখ ক'রে বসবার আসন আছে, সে ট্রামে গোপেন সেই সিটে বসে। অন্য সিটের লোকে যখন ঘাড় বেঁকিয়ে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে লেডিস সিটের দিকে তাকায়, তখন ঐ সিটে বসে সে মুচকে হাসে।

সাড়ে ন'টা বেজে গিয়েছিল। আজ আসছিল সে খিদিরপুর থেকে। কোম্পানীর লরীতে গঙ্গার ধার দিয়ে এসে সে মোড়ে নামল। মোটরের ইঞ্জিনের গরম এবং পেট্রোলের গন্ধ থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে সে আরাম বোধ করলে। অভ্যাস মত একবার বললে—শালাঃ! তারপর একটা বিড়ি ধরিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করলে। শরীর তার সবল—এবং এই কাজের অভ্যাস তার পঁচিশ বছরের, ক্লান্তি সে বড় বোধ করে না। ডালহৌসির কোণে সে এসে দাঁড়াল। এ কি রে বাবা! ট্রাম যে সার সারি দাঁড়িয়ে! ব্যাপার কি?

১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৬ সাল, রাত্রি সাড়ে ন'টা।

আজাদ হিন্দ ফৌজের অন্যতম নায়ক—ক্যাপ্টেন রসিদ আলি যাঁর সাত বৎসর কারাদণ্ডের আদেশের প্রতিবাদে ছাত্রশোভাযাত্রী-দের উপর বেলা বারোটা থেকে পাঁচটা পর্য্যন্ত পুলিশ দু'বার লাঠি-

চার্জ্জ করেছে। ডালহৌসি স্কোয়ারের উত্তর-পূর্ব্ব এবং উত্তর-পশ্চিম কোণে কালো পিচের রাস্তার উপর রক্তের দাগ রঙ দেখে আর চেনা যায় না, আলো বাতাস লেগে রক্তের লাল জৌলুষ কালচে হয়ে পিচের রঙের সঙ্গে প্রায় এক হয়ে গিয়েছে; কিন্তু এক আধটা জায়গায় জমাট-বাঁধা রক্তের ভিতরটা এখনও কাঁচা আছে। হাফসোল মারা সত্ত্বেও গোড়ালী ক্ষয়ে-আসা স্যাণ্ডেলের তলাটা—দুপুরের গলা পিচের মত আঠালো কিছুতে পড়ে চট-চট করে উঠল।

ফেয়ারলি প্লেসের সামনে; উত্তর-মুখে চলে গিয়ে ক্লাইভ ষ্ট্রীট। কি লাগল পায়ে? কে জানে কি? হন্ হন্ করে চলেছে গোপেন। কিন্তু ব্যাপারটা কি? কাকেই বা জিজ্ঞাসা করবে? জনশূন্য ডালহৌসি স্কোয়ার। খালি ট্রামগুলো দাঁড়িয়ে আছে। কণ্ডাক্টার ড্রাইভারেরা উদাসীনের মত দাঁড়িয়ে অথবা বসে রয়েছে। জিজ্ঞাসা করলেও উত্তর দেয় না। গোপেন চলেছিল—সব চেয়ে অগ্রগামী শ্যামবাজারের গাড়ীখানার উদ্দেশে। স্কোয়ারের এ মাথায় এসে গোপেনের খেয়াল হল—কড়া পুলিশ পাহারা রয়েছে চারিদিকে। মনটা এবার তার ছ্যাঁৎ করে উঠল।

সাইড-কার লাগানো মোটর-বাইকে তিন জন সার্জ্জেণ্ট ভট্-ভট্ করে তাকে অতিক্রম করে লালবাজারে গিয়ে ঢুকল। লালবাজার থেকে লরী-বোঝাই পুলিশ বার হচ্ছে। থমকে দাঁড়াল গোপেন। খড়ের ঘরে আগুন লাগার প্রথম অবস্থায় পোড়ার মৃদু গন্ধে যেমন মানুষ চমকিত এবং সন্ধানী হয়ে উঠে—তেমনি ভাবেই সে সতর্ক হয়ে উঠল। একটু ভেবে নিয়ে সে সামনে না এগিয়ে—স্কোয়ারের কোণেই যে ট্রামখানা দাঁড়িয়েছিল, সেইখানাতে গিয়ে উঠে বসল।

কণ্ডাক্টার তার দিকে একবার তাকালে, তার পর মুখ ফিরিয়ে বসল।

গোপেন প্রশ্ন করলে—গাড়ী বন্ধ কেন ভাই? ব্যাপার কি?

কণ্ডাক্টার তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললে—এঃ, রক্ত? আপনি বুঝি মাড়িয়ে এলেন?

গোপেন সবিস্ময়ে তাকিয়ে দেখলে—রক্তে জুতোর ছাপ পড়েছে ট্রামের মেঝেতে। নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখলে—ডান পায়ের স্যাণ্ডেলের সোলের পাশে জমাট রক্তের কুটি লেগে রয়েছে এখনও। কিছু বুঝতে না পেরে সে কণ্ডাক্টারের মুখের দিকে তাকালে। মনে হ'ল কণ্ডাক্টার জানে—তার কথাটা মনে পড়ল বিদ্যুতের মত—আপনি মাড়িয়ে এলেন বুঝি।

কণ্ডাক্টার বললে—কোথা থেকে আসছেন আপনি?

—খিদিরপুর থেকে। কি ব্যাপার বলুন তো ভাই?

—ষ্টুডেন্টস প্রসেসনের উপর পুলিশ লাঠি চার্জ্জ করেছে। সেন্ট্রাল এ্যাভিনিউয়ে লরী পুড়েছে, গুলী চলেছে। ট্রাফিক বন্ধ। গোপেন নেমে পড়ল ট্রাম থেকে। সর্ব্বনাশ! কি বিপদ বল দেখি। লরী পুড়েছে, গুলী চলছে, ট্রাম বন্ধ; তাকে যেতে হবে শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়।

আবার গোপেনকে দাঁড়াতে হল। শুধু দাঁড়াল না, দু' পা পিছিয়ে এসে দাঁড়াল। ট্রামের জানালা দিয়ে উজ্জ্বল আলো পড়েছে রাস্তার উপর। রক্তের দাগ! দিনের আলোয় লোকে সভয়ে সসম্মানে পা দিয়ে মাড়িয়ে যায় নাই—পাশ কাটিয়ে গিয়েছে। রাত্রের অন্ধকারে দু'-চারটে পা পড়েছে। তার মধ্যে একটা ছাপ তার পায়ের স্যাণ্ডেলের। হেঁট হয়ে দেখলে গোপেন। গোঁ-গোঁ

করে পুলিশের লরী যাচ্ছে। শিউরে উঠে গোপেন খাড়া হয়ে দাঁড়াল; তারপর হন-হন করে চলতে আরম্ভ করলে।

শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়। সে কি এখানে? গির্জ্জের মাথার ঘড়িতে বাজছে পৌনে দশটা।

মানুষের মধ্যে আতঙ্ক এবং উত্তেজনা পাশাপাশি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এক চোখে আতঙ্ক, এক চোখে উত্তেজনা—এখনি মানুষের চোখে-মুখে ভয় ফুটে উঠছে—পরমুহূর্ত্তেই চোখে উত্তেজনার ঝিলিক খেলে যাচ্ছে; হাত মুঠি বেঁধে উঠছে। দোকান-পাট বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

হন-হন করে চলছে গোপেন। মধ্যে মধ্যে থমকে দাঁড়াচ্ছে। সামনের দিক্‌টা যতদূর সাধ্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছে—কোথাও পুলিশ কি সার্জ্জেণ্ট রয়েছে কি না? কান সজাগ করে রেখেছে—লরী কি মোটর-বাইকের শব্দ শুনলেই গলিতে ঢুকতে হবে—অথবা কোথাও আশ্রয় নিতে হবে। নভেম্বর মাসে একটা হাঙ্গামা হয়ে গিয়েছে। সে জানে—যেতে যেতে ওরা ধাঁই করে গুলী ছুঁড়ে দিয়ে যায়। যে মরল—সে মরল। রাস্তার মোড়ে—বিশেষ ক'রে বড় রাস্তার মোড়ে—থমকে দাঁড়াতে হবে। মোড় ফিরবার আগে—উঁকি মেরে দেখে নিতে হবে—ওদিকে কি ব্যাপার চলছে—তারপর হয় পিছিয়ে আসতে হবে অথবা দ্রুতগতিতে সেই রাস্তায় পড়ে এক ধার ঘেঁষে চলতে হবে। গোপেনের বন্ধু বীরু রসিক লোক; থিয়েটার নিয়েই মেতে আছে, সে বলেছিল—"মোড়ের মাথায় এসে স্রেফ নাকটি আগে বাড়িয়ে দিবি। স্রেফ নাকটি। নাকের পাশ দিয়ে বাঁকা চোখে দেখবি। তারপর একবার হাতখানি বাড়াবি। তাতেও যদি বন্দুকের আওয়াজ না শুনিস, তখন আর

একবার ভাল করে দেখে, সট্। সাঁ ক'রে বেঁকে—সন্ সন্ ক'রে একদম হাওয়া।"

কথাটা রসিক বীরুর মুখে বেশ লেগেছিল সেদিন। আজ সেণ্ট্রাল এ্যাভিনিউর মুখে এসে কথাটার চেহারা পালটে গোপেনের মনে উদয় হল। থমকে দাঁড়াল গোপেন।

সামনে বউবাজার সেণ্ট্রাল এ্যাভিনিউ জংসন। চৌমাথায় চারটে আলোর ছটা পড়েছে। পুলিশ-লরী দাঁড়িয়ে আছে। বউবাজারের ছু'দিকের ফুটপাত ফাঁকা; ছু'দিকের দোকানপাট—অধিকাংশই কাঠ-কাঠরার দোকান সব বন্ধ। সাড়ে দশটায় অবশ্য সবদিনই দোকানগুলো বন্ধই থাকে—কিন্তু দোকানের গায়ে পান বিড়ি সিগারেটের দোকানগুলো খোলা থাকে। প্রত্যেক দোকানের সামনে ছু'-চারজন বসে থাকে বেকার এবং রসিকের দল। গুলতান করে। আজ বিড়ি সিগারেটের দোকানও বন্ধ। রাস্তার গ্যাসপোষ্ট—ট্রামের পোষ্টগুলো শুধু দাঁড়িয়ে আছে। দূরে ভট-ভট শব্দ উঠছে। সেণ্ট্রাল এ্যাভিনিউ থেকে একটা একটা জোরালো আলোর ঝাঁটার মত ছটা—রাস্তার জংসনের উত্তর-পশ্চিম কোণের বাড়ীটার গায়ে পড়ে ক্রমশঃ পশ্চিমমুখী হচ্ছে। এসপ্ল্যানেড থেকে সার্জেণ্টের মোটর-বাইক বউবাজারে—পশ্চিমমুখ মোড় ফিরছে নিশ্চয়। চঞ্চল হয়ে উঠল গোপেন। আলোটা এইবার তার উপর পড়বে। হঠাৎ সে আতঙ্কে চমকে উঠল। ছু'টো বাড়ীর মাঝের একটা সরু বন্ধ গলির মুখ থেকে ছু'জন লোক তীরের মত ছুটে বেরিয়ে তাকে অতিক্রম করে তারই পাশের উত্তরমুখী একটা গলিতে সেঁধিয়ে গেল। সমস্ত শরীর শিউরে উঠল গোপেনের।

দুম—দুম—দুম। বন্দুক বা পিস্তলের আওয়াজ হচ্ছে কোথাও। ওদিকে আলোটা তার পাশে এসে পড়েছে। গোপেন মুহূর্তে পাশের ওই উত্তরমুখী গলিটাতে ঢুকে গেল।

অন্ধকার গলি-পথ অনেকটা দূরে দূরে এক একটা গ্যাস জ্বলছে। গোপেন নিজের পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছে। একটু আগেই একটা বাঁকের আড়ালে সেই লোক দু'টি দাঁড়িয়ে আছে। নিস্তব্ধ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, চোখে বিচিত্র ভীত এবং ভয়াল পলকহীন দৃষ্টি।

তাদের সামনে পড়ে চমকে দাঁড়িয়ে গেল গোপেন। কে এরা? হাতে ছুরী নাই তো? লোক দু'টি আঙুলের ইসারা করে মৃদুস্বরে বললে—চলে যাও। গলি গলি চলে যাও। দাঁড়িয়ো না!

গোপেন ছুটতে লাগল।

—আস্তে। এত জোরে পায়ের শব্দ করো না।

আবার দাঁড়িয়ে গোপেন পিছন ফিরে দেখলে। লোক দু'টি এগিয়ে চলেছে সন্তর্পণে। লোক দু'টির হাতে কি?

ট্রামের পথের পাথর। ষ্টোন ব্যালাষ্ট।

অবাক্ হয়ে গেল গোপেন। গুলীর উত্তরে এরা ঢেলা ছুড়ছে। এরা পাগল না কি?

দুম—দুম। পিস্তলের আওয়াজ হল বউবাজারে।

লোক দু'টি আবার গলিতে ঢুকে পড়ছে দ্রুতপদে।

গোপেন ছুটল আবার সভয়ে। গলি-পথ যে দিকে চলেছে—সেই পথে চলেছে সে। ছুটে চলার গতিবেগে হঠাৎ সে গলির মোড় ফিরে একেবারে আলোকিত প্রশস্ত রাজপথের উপর এসে পড়ল।

সেণ্ট্রাল এ্যাভিনিউ।

সামনেই রাস্তার ওপর ধোঁয়া এবং আগুন। মিলিটারী ট্রাকে আগুন জ্বলছে। রাস্তার দু'পাশে জনতা। আগুনের লালচে আলোর আভা পড়েছে সকলের মুখের উপর। জ্বলন্ত মিলিটারী ট্রাক্‌টার সামনে রাস্তার এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্য্যন্ত জন কয়েক মিলে কি যেন টেনে নিয়ে আসছে। ডাষ্টবিন—ময়লা-ফেলা হাত-গাড়ী—কোথা থেকে কার একখানা মাল-বওয়া ঠেলাও নিয়ে এসেছে। পাশাপাশি সাজিয়ে চলছে দ্রুত গতিতে। ব্যারিকেড তৈরী করে রাস্তা বন্ধ করছে!

—আসছে—আসছে। দূরপ্রসারী প্রখর উজ্জ্বল দুটো আলো—সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে আসছে ঝড়ের মত মোটরের আওয়াজ।

ঢুকে পড়ল গোপেন গলির মধ্যে।

আওয়াজ হচ্ছে বন্দুকের।

ফুসফুস ফেটে যাচ্ছে। পা দুটো ভেঙ্গে পড়ছে। চোখ ফেটে কান্না আসছে। অন্ধকার গলিপথে ঘুরে ঘুরে উত্তরমুখে চলেছে! কিন্তু এখনও সেন্ট্রাল এ্যাভিনিউ পার হয়ে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের দিকে আসতে পারে নি।

হ্যারিসন রোড ও এ্যাভিনিউ জংসনে দু'খানা লরী এখনও জ্বলছে। গুর্খা পুলিশ এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সার্জেণ্ট পাহারা দিচ্ছে ওখানটায়।

হ্যারিসন রোড পিছনে ফেলে অনেকখানি উত্তরমুখে এসে সে আবার একবার চেষ্টা করলে চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ পার হবার; স্থানটা বেশ নির্জ্জন। একটু দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে দেখে, সে এক ছুটে এপারে এসে পড়ল। একটু আগে পূর্ব্বমুখী একটা গলি। গলিতে ঢুকে সে একটা বাড়ীর সিঁড়িতে বসে হাঁপাতে লাগল। একটা বিড়ি ধরালে। এবার ফেব্রুয়ারীর প্রথম

সপ্তাহেই শীত ফুরিয়েছে, তার উপর এই ছুটোছুটি, এই উৎকণ্ঠা, কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে। তেলচিটে ময়লা রুমালখানা বার করে সে মুখ মুছলে। এতক্ষণে অপেক্ষাকৃত আশ্বস্ত হয়ে সে মন্থর পদক্ষেপে চলতে চলতে উৎকণ্ঠার পরিবর্তে ক্রোধে ক্ষোভে অধীর হয়ে উঠল।

মিটিং আর প্রসেসন। প্রসেসন আর মিটিং। দিল্লী চলো, জয় হিন্দ্, বন্দেমাতরম, ইনক্লাব জিন্দাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক, ভারত ছাড়ো! চীৎকার—চীৎকার আর চীৎকার। গুলী খাচ্ছে, মরছে, রক্তে ভেসে যাচ্ছে কলিকাতার পিচের রাস্তা!

—ওদের আছে বন্দুক, ওদের আছে পিস্তল—পুলিশের হাতে লাঠি—গুলী চালাচ্ছে—লাঠি মারছে। বন্দুকের ডগায় আছে সঙ্গীন। মারছে খোঁচা! কুকুরের মত মারছে। মার—মার—মার—মেরে নে। সাধ মিটিয়ে মেরে নে। ভগবান আছেন!

পথের পাশের একটা ঘড়িতে ঘণ্টা বাজার আওয়াজ হচ্ছে।

এক, দুই, তিন—সাত-আট-দশ—এগারো—এগারোটা বাজল।

সহরের এ দিক্‌টা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। ঘুমিয়েছে সব।

ফট—ফট। দুম—দুম। নিস্তব্ধতার মধ্যে চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ-এ গুলী চলার শব্দ এত দূরেও শোনা যাচ্ছে। এখনও চলছে গুলী। ঢেলার বদলে গুলী। হে ভগবান্!

শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার পরিসর রাক্ষুসে হাঁয়ের মত। ওখানে গিয়ে পড়লে আর পাশ কাটাবার জায়গা নাই। নিশ্চয় সেই গোল জায়গাটায় বন্দুক নিয়ে পাহারা দিচ্ছে গুর্খা পুলিশ ফিরিঙ্গী সার্জেণ্ট। ওটা একটা হাঙ্গামার ঘাঁটি। নভেম্বর মাসে ওখানে গুলী চলা গোপেন স্বচক্ষে দেখেছে।

সে শিউরে উঠল—সঙ্গে সঙ্গে অকারণে—নিজের অজ্ঞাতসারে মধ্যরাত্রির জনহীন নিস্তব্ধ রাজপথ ধ্বনিচকিত করে চীৎকারে করে উঠল—আ—হা-হা হা! নিজের জানুর উপরে একটা ঘুঁসি চালিয়ে দিলে।

গলি-পথে খানিকটা এসে সে বড় রাস্তাটা পার হল। নিউ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট। ছোট রাস্তা ধরে বাগবাজার ষ্ট্রীটে পড়ে সে নিশ্চিন্ত হল।—শা—লাঃ!

মাঝ-রাত্রির কলকাতার পথ অত্যন্ত বিশ্রী। গা ছম ছম করে। কোথাও জনমানব নাই, দু'পাশের বড় বড় বাড়ীগুলোর দোর বন্ধ—জানালা দিয়ে দেখা যায় ভিতরে থম থম করছে! লাইট-পোষ্টের মাথায় গ্যাস বাতিগুলো ভাবে জ্বলছে; ওতেই যেন ভয় বেড়ে যায়।

দু'জন লোক! সতর্ক হল গোপেন। রাস্তার দিকে পিছন ফিরে দেওয়ালের গায়ে কি করছে? পরক্ষণেই তারা রাস্তার দিকে ফিরল। গোপেনর উল্টো মুখে চলে গেল। দু'জন অল্পবয়সী ছেলে; ছেলে নয়—কুড়ি-বাইশ বছর বয়স হবে। আবছা চিনতেও যেন পারছে ওদের। দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে দেখলে, খবরের কাগজে লাল কালীর মোটা হরফে কিছু লি দেওয়ালে সেঁটে বেড়াচ্ছে।

কেয়াবাৎ রে বাবা! বহুৎ আচ্ছা ভাই। ঠিক আছে এরা। রাত্রে ঘুম নাই, বুকে ভয় নাই, কাগজের উপর লাল কালীর হরফে কথার আগুন জ্বালিয়ে ছড়িয়ে ছড়িয়ে চলছে। কাল সকালে যে পড়বে তার বুকে লাগবে। কি লিখেছে?

"বিপ্লব—বিপ্লব।

বিপ্লবের প্ল্যান চাই; মন্ত্রিত্ব নয়।

লক্ষ প্রাণ বলি দিতে প্রস্তুত ; নেতৃত্ব কই ?”

অস্বস্তি বোধ করল গোপেন। সে দ্রুতপদে চলতে লাগল। একটু আগেই তার বাড়ী।

টং।

কোন বাড়ীর ভেতরে ঘড়ি বাজছে। বোধহয় একটা বাজছে।

ঢং। পানওয়ালার বন্ধ দোকানটার মধ্যে ঘড়ি বাজছে। ঢং। মিষ্টিওয়ালার দোকানের ঘড়ি এটা।

নিজের বাড়ীতে বন্ধ দুয়ারে কড়া নাড়লে সে।

পাশের বড় বাড়ীতে ঘড়িটায় এতক্ষণে একটা বাজল—ঢং।

—নেবু! নেবু! এই নেবু।

গোপেনের মেয়ের নাম নেবু। ঘুমিয়েছে না মরেছে সব। ছেলেগুলো ঘুমাতে পারে—ছেলেমানুষ—ভাবনা-চিন্তা তাদের হবার কথা নয়। কিন্তু শান্তি ঘুমালো কি করে! রাত্রি একটা বাজল, কলকাতার পথে গুলী চলছে সন্ধ্যে থেকে—খবর নিশ্চয় পেয়েছে—তবু সে ঘুমায় কি করে ?

প্রচণ্ড জোরে কড়া নাড়লে গোপেন। চীৎকার করে ডাকলে —শান্তি! এই! নেবু!

যাক—উঠেছে। দাঁতে দাঁতে টিপে—হাতের চড় সে ঠিক করে রাখলে। খুলে দিক দরজা।

দুই

রাত্রি দুটোয় শুয়ে ভোর ছ'টায় ওঠা। বেঙ্গল টাইম ছ'টা—স্বাভাবিক ভাবে ঘুম ভাঙে নাই; ঘুম ভাঙিয়ে দিলে স্ত্রী। গায়ে হাত দিয়ে ডাকলে তবে ঘুম ভাঙল।

ছেলেগুলো তার আগে থেকেই চীৎকার করতে আরম্ভ করেছিল। ঘুমের পাতলা ঘোরের মধ্যে দূরের আওয়াজের মত কানেও আসছিল, খোলা জানালা দিয়ে সকালের আলোও লাগছিল চোখের বন্ধ পাতার উপর, কিন্তু তার ক্লান্ত চৈতন্যের উপর শব্দের আহ্বান আলোর স্পর্শ স্বাভাবিক প্রতিধ্বনি এবং প্রতিচ্ছটা তুলে তাকে সজাগ করতে পারে নাই। পরিশ্রান্ত ক্লান্ত স্নায়ুতন্ত্রীগুলো অবস্থা ঢিলে হয়ে পড়া তারের যন্ত্রের মত; অযত্নে-পড়ে-থাকার ফলে মাকড়সার জালে ঢাকা ক্যামেরার লেন্সের মত। যে প্রয়োজন মত বিশ্রামের তৃপ্তি এবং পুষ্টিতে স্নায়ুতন্ত্রী সুস্থতা এবং পরিমার্জ্জনা লাভ করে—সে বিশ্রাম তার তখনও হয় নাই। তার গায়ে হাত দিয়ে স্ত্রী ডাকলে—"ওঠ। শুনছ। ওঠ।"

অত্যন্ত নির্লজ্জ এবং বেহায়া এই মেয়েটা। কাল রাত্রে এক চড় খেয়েছে। আবার চড় খাবার জন্য ঝুঁকে মুখ নিয়ে এগিয়ে এসে তাকে ডাকছে। চড় মারবার জন্য তার অন্তরে প্রবৃত্তি গর্ত্তের মধ্যে খোঁচা-খাওয়া সাপের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুরতে লাগল।

—"ওঠ। সবাই বলছে ট্রাম বন্ধ। হেঁটে আপিস যেতে হলে—"

—"ট্রাম বন্ধ?" এবার ধড়মড় করে উঠে বসল গোপেন। —"কে বললে?"

—"কানু বলছে।"

—"কানু ?"

—"হ্যাঁ আমাদের বিলাস বাবুর ছেলে কানু।"

কানুর পরিচয়ে প্রয়োজন ছিল না গোপেনের কাছে। শুধু গোপেন কেন—এ পাড়ার কানুর পরিচয় কারুর কাছেই দিতে হয় না ; কানু এ পাড়ায় বিখ্যাত আপনার পরিচয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত। গোপেন বলতে চেয়েছিল—কানু যখন বলেছে তখন খবর খাঁটী সত্য।

এখান থেকে খিদিরপুর ডক। অন্ততঃ ষ্ট্র্যাণ্ডরোড—আপিস পর্য্যন্ত। তার পর আপিসের লরী আছে। অন্ততঃ সুপারভাইজার ফিরিঙ্গী সায়েবের টু-সীটার মোটরটার পিছনে ক্লীনার-সীটটা আছে।

গোপেনের মনে জেগে উঠল সুদীর্ঘ পথ, সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল—কাল রাত্রের রাস্তার অবস্থার কথা। হঠাৎ সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল—নিজের ছেলেগুলোর উপর। বড় ভুটোতে একটা তেরঙ্গা পতাকা নিয়ে বাড়ীর সামনে পথের উপরেই মুভমেণ্ট আরম্ভ করে দিয়েছে। এই সে-দিন নেতাজীর জন্ম-দিন আর স্বাধীনতা দিবস—২৩শে জানুয়ারী আর ২৬শে জানুয়ারী উপলক্ষে ন্যাকড়া কেটে রঙ করে—সেলাই করে জুড়ে পতাকাটা তৈরী করেছিল সে আর শান্তি। এখন সেইটে ঘাড়ে নিয়ে বড় ভুটো চীৎকার করছে—জয় হিন্দ্! ব—ন্দে—মা—তরম! জয় হিন্দ্!

পিছনে থেকে ছোটগুলো সমস্বরে প্রতিধ্বনি তুলছে।

গোপেন দাঁতে দাঁত চেপে প্রচণ্ড আক্রোশে এগিয়ে এসে বড় ছেলেটার গালে বসিয়ে দিলে এক চড়।—"হারামজাদা—শূয়ার—বদমাস!"

তার পর হন্ হন্ করে বেরিয়ে গেল বড় রাস্তার দিকে—এখান তার সঠিক খবরের প্রয়োজন। জাহাজে মাল বোঝাই হচ্ছে; মাল নামছে। না গেলে চাকরী থাকবে না। চাকরী গেলে আর হবে না। ট্রামের মান্থলী, সুবিধা দরে র‍্যাশন—চল্লিশ টাকা মাইনে! গেলে আর হবে না।

*　　　　*　　　　*

আশ্চর্য্য!

বাড়ীর দোরে রোয়াকে বাচ্চা বাচ্চা ছেলেগুলো নাগাড় চেঁচিয়ে যাচ্ছে।—জয় হিন্দ্, জয় হিন্দ্! ব—ন্দে—মা—তরম্।

জয় হিন্দের খুদে পল্টন! গোপেনদের বস্তীর হাঁপানীর রোগী বুড়ো ধরণী চাটুজ্জে আবার এদের নাম বার করেছে জয় হিন্দের কাঠবেড়ালী। রামায়ণ অবশ্যই পড়েছে গোপেন; সমুদ্রের উপর সেতু বাঁধবার সময় কাঠবেড়ালীদের কাহিনীটুকু খুবই চমৎকার কিন্তু তবুও এই নামকরণের জন্য গোপেনের আগে রাগ হ'ত; মনে হ'ত জয়হিন্দ শব্দটিকে সঙ্গে সঙ্গে জয়হিন্দের পবিত্র মহান চেষ্টাকে বুড়ো ব্যঙ্গ করছে। আজ সে দাঁতে দাঁত ঘষে বরাবর ওই নামটাই উচ্চারণ করলে মনে মনে। ঠিক নাম দিয়েছে বুড়ো।

বড় রাস্তায় এখানে ওখানে জটলা। দাঁড়িয়ে শোনবার অবকাশ নাই গোপেনের, শ্যামবাজারের চৌমাথা পর্য্যন্ত না গেলে তার প্রয়োজনীয় সঠিক খবর মিলবে না। কিন্তু না শুনেও সে বুঝতে পারছে জটলায় কি জট পাকাচ্ছে তারা। স্বাধীন ভারতের দল খুব তড়পাই চালাচ্ছে। চালাক। কারও বাপের পয়সা আছে, কেউ বেকার। কর, তোমরা ভারত স্বাধীন কর। গোপেনকে তোমরা বাদ দাও। গোপেনের সঙ্গে তোমাদের কারু মিল নাই।

ভাদ্রার ব্যাপারীর চেয়েও সে হীন ব্যক্তি, তবু তাকে জাহাজের খবর রাখতে হয়। তাকে যেতে হবে ষ্ট্রাণ্ড রোড, খিদিরপুর। ট্রাম চাই তার।

ট্রাম বন্ধ।

বাসগুলো এসেছিল—সেগুলো সামনে গ্যারেজ বোর্ড টাঙিয়ে চলে যাচ্ছে। দোকানগুলো বন্ধ। পাঁচ মাথার ফুটপাথে এরই মধ্যে লোক জমেছে! মজা দেখতে এসেছে সব। দেখ—মজা দেখ! তরী-তরকারীর বাজার বন্ধ করবার সুর উঠেছে। যে যা পারছে সংগ্রহ করে নিচ্ছে।

একটা ক্ষুব্ধ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে হঠাৎ একটা চায়ের দোকানে ঢুকে বসল। এরাও দোকান বন্ধ করবার উদ্যোগ করছে। দোকান গোপেনের চেনা, গোপেনকেও ওরা চেনে। গোপেন নিজের র‍্যাশন থেকে কিছু-কিছু চিনি সরবরাহ করে থাকে ওদের। চিনি খেতে মিষ্টি—এবং পুষ্টিকর, উপাদেয় ও উপকারী দুইই বটে কিন্তু সে খাওয়ার ভাগ্য গোপেনের নয়। কোম্পানীরূপ চিন্তামণি চিনি জোগায়, ভাগ্যহত গোপেন সেই সস্তাদরের চিনি এখানে চড়া দামে দিয়ে কিছু আয় বৃদ্ধি করে নেয়।

খবরের কাগজটা টেনে নিয়ে সে বললে—এক কাপ চা দিও তো।

—চা ?

—হ্যাঁ। এখনও চা খাইনি। দাও।

খবরের কাগজ। এই এক জঞ্জাল! ভোরে উঠেই লোককে জানিয়ে বেড়াচ্ছে এই হ'ল—এই হ'ল—এই হ'ল; এখন তোমরা এই কর—এই কর—এই কর। জাহাজ বোঝাই করতে হয় না; কাগজে লিখে দাও ফেলে, সীসের অক্ষর সাজিয়ে—কালী মাখিয়ে

—দাও ... কলে—বাস, হাজার হাজার ছাপা হ'য়ে গেল ; তার পর—জোর খবর বাবু, কলকাতায় গুলী চললো—রক্তারক্তি কাণ্ড। হাঁকে ভরে গেল গোটা কলকাতা—গোটা দেশ। এই যে—মোটা মোটা হরফে ছেপেছে—

সোমবার পুনরায় কালকাতায় নিরস্ত্র ছাত্র শোভাযাত্রীদের উপর পুলিশের আক্রমণ

গুলির আঘাতে এক জন নিহত, ১... আহত

লাঠি চার্জ্জ ও কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার

লাঠির আঘাতে ২০ জন আহত : ২৭ জন গ্রেপ্তার।
সকলের নীচে মোটা মোটা হরফে—

২০ খানি মিলিটারী ট্রাকে অগ্নি-সংযোগ।

মুহূর্ত্তে তার দৃষ্টির সম্মুখে খবরের কাগজের বুকে পিপড়ের সারির মত ছাপা হরফের লেখা মুছে গেল—মিলিয়ে গেল। মনে পড়ে গেল—আবছা আলোর মধ্যে রাস্তার উপর মিলিটারী ট্রাক জ্বলছে। লাল আলো—তার আভা পড়েছে মানুষের মুখে চোখের সাদা ক্ষেতে লাল ছটা ঝিক্‌মিক্ করছে।

একটা উত্তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সে। আবার পড়তে আরম্ভ করলে।

"আজাদ হিন্দ ফৌজের ক্যাপ্টেন রসিদ আলির উপর দণ্ডাদেশের প্রতিবাদ এবং রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাবী করিয়া হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রগণের সম্মিলিত শোভা-যাত্রার উপর মধ্যাহ্ন সাড়ে বারোটা এবং অপরাহ্ণ চার

ঘটিকার সময় ডালহৌসি স্কোয়ারে পুলিশ দুট বার লাঠি চার্জ্জ করে। ইহার ফলে ২০ জন ছাত্র আহত হয়। ২৭ জন গ্রেপ্তার হয়। অষ্টাদশ বর্ষ বয়স্ক আমেদ হোসেন নামক জনৈক যুবকের আঘাত বেশী বলিয়া তাহাকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হইয়াছে।”

চঞ্চল হয়ে গোপেন এবার তার সাণ্ডেল-জোড়াটার দিকে তাকালে। কিছু আর নজরে পড়ে না। ডালহৌসি—থেকে বাগবাজার পর্য্যন্ত গলি রাস্তার বুকে লাল রক্তের ছাপ মেরে মুছে গিয়েছে। ধারে—যেন লেগে আছে। হ্যাঁ।

উঠল গোপেন।

অনেকে হেঁটে আপিস চলেছে।

ট্রাম বন্ধ। বাস বন্ধ। রিক্সাও বন্ধ। কাগজেই রয়েছে—ট্রামওয়ে-ওয়ার্কার্স, বাস-ওয়ার্কার্স এবং রিক্সা-মজদুর-ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট মিঃ মহম্মদ ইসমাইল সোমবার রাত্রে বিবৃতি প্রচার করেছেন—এই লাঠি চার্জ্জের প্রতিবাদে সব আজ ধর্ম্মঘট করেছে। হরতাল পালন করবে।

আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সে। তার আর কোন উপায় নাই।

পুলিশের লরী চলে গেল একখানা। গুর্খা এবং সার্জ্জেণ্ট। গুর্খারা রাইফেল বাগিয়ে ধরে চলেছে, সার্জ্জেণ্টদের হাতে রিভলভার।

দাঁতে-দাঁত টিপে সে দাঁড়িয়ে রইল। শাসন, শাসন, নিষ্ঠুর শাসন, অকারণ নিষ্ঠুর শাসন ছাড়া আর কিছু নাই এই দুনিয়ার। বার কয়েক নিজের মাথাটা সে ঝাঁকি দিয়ে উঠল। মাথার বড়

বড় চুলগুলো ছড়িয়ে পড়ল মুখের উপর। সে-গুলোকে বিন্যস্ত করে নিয়ে সে বাড়ীর দিকে চলল। ছুটতে হবে! এখুনি ছুটতে হবে! এ আর সহ্য হচ্ছে না!

* *

গোপেনের বাড়ীর সামনে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে নেবু। চোদ্দ-পনের বছর বয়স বোধ হয়। ছিল ছিলে লম্বা সবে বাল্য উত্তীর্ণ হয়ে কৈশোরে পা দিচ্ছে। এখনও ফ্রক প'রে থাকে। কাপড় দুষ্প্রাপ্য তা ছাড়া কণ্ট্রোলেও যে দাম কাপড়ের—সে কিনে দিতে নেবুর বাপের সাধ্যে কুলোয় না। মধ্যে মধ্যে মায়ের কাপড় টেনে পরে সে। খানিকটা দূরে আড্ডা বসেছে কানুদের। তের আঠারো থেকে বিশ বছরের ছেলেদের দল। জোর আলোচনা চলছে। গতকালের ঘটনার আলোচনা।

কানু বলছিল—আমি নিজে ছিলাম সেখানে। নিজের কানে শুনে এসেছি।···কলেজষ্ট্রীটে···প্রতিষ্ঠানে দাসগুপ্ত মশায় এসে সব পার্টিকে খবর দিয়ে আনিয়াছিলেন। মায়···লীগ পর্য্যন্ত এসেছিল। ওদের সেক্রেটারী আর রাঙামিয়াকে আমি নিজের চোখে দেখেছি। ···দাসগুপ্ত বললে—কার কি কথা বলুন। ব্যাপারটা এখন লীগেরও নয়—কংগ্রেসেরও নয়—অন্য কোন পার্টির একার নয়। এখন দায়িত্ব সকলের। সব বললে আপন-আপন কথা, ঠিক হল, আজ সকলে সারওয়ার্দ্দী সাহেব—আর দাসগুপ্ত—যাবে পুলিশ কমিশনারের কাছে। দরকার হলে সারওয়ার্দ্দী মিষ্টার কেসীর সঙ্গে দেখা করে সোজা জিজ্ঞাসা করবে—নভেম্বরের ব্লাডবাথে কি গভর্ণমেণ্টের তৃপ্তি হয় নাই—আরও একটা ব্লাডবাথ কি চান গভর্ণমেণ্ট? চাইলে অবশ্যই দিতে হবে, দেবে কলকাতার হিন্দু-

মুসলমান। তারপর যেতে দেয় ভাল—না দেয় প্রসেশন জোর ক'রে যাবে। লীড করবে সারওয়ার্দ্দী আর দাসগুপ্ত!

কাম্বুর বন্ধুর দল স্তব্ধ হয়ে রইল।

নিতান্ত সাধারণ ছেলে সব। অধিকাংশই ম্যাট্রিক ক্লাসের ছাত্র, দু একবার ফেল করা ছেলেই প্রায় সব, জন দুয়েক—ফার্ষ্ট ইয়ারে পড়ে, একজন পাশ ক'রে বসে আছে। অবস্থায় নিতান্তই নিম্ন মধ্যবিত্ত, তবে গোপেনের চেয়ে সকলের বাপের অবস্থাই ভাল; এই বস্তীর যে দিকটা ভাল অর্থাৎ পাকা মেঝের সঙ্গে দেওয়ালও একখানা ইটের, চালে যে দিকটায় রাণীগঞ্জের টালি, সেই দিকটায় থাকে; কেউ কেউ পাকা বাড়ীর বাসিন্দা,—দুখানা ঘর, বারান্দায় ঘেরা এক ফালি রান্নাঘর—ভাড়া তিরিশ তাও যুদ্ধের আগে থেকে আছে বলে। সকালে ঘণ্টাখানেক পড়ে—দশটা থেকে চারটে পর্য্যন্ত ইস্কুলে হল্লা করে, বিকেলে বৈশাখ থেকে ভাদ্র পর্য্যন্ত ফুট বলের মাঠে, শীতকালটা ক্রিকেটের আসরে ইডেন গার্ডেনে—সন্ধ্যা আটটার পর সিনেমায় কাটায়। ধারের মধ্যে পরস্পরের কাছে দু-চার আনা ধার—সিগারেট বিড়ির দোকানে কিছু ধার ছাড়া আর কিছুর ধার ধারে না। পর্ব্বে পার্ব্বনে পূজোগুলি আছে—তার মধ্যে সরস্বতী পূজাটাই ওদের নিজস্ব—তার গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত সবই নিজেরা করে, বাকী গুলোয় ভলেন্টিয়ারী করেই ক্ষান্ত হয়। পাড়ায় পিকপকেট কি চোর কি মাতালকে তাড়া করে, ধরতে পারলে ঠেঙায়, দোকানীর সঙ্গে খরিদ্দারের ঝগড়া হলে তার মীমাংসা করে। মোটকথা কলকাতার গত একশো বছরের অতি সাধারণ, ইণ্টেলেকচুয়াল্‌সদের নীচেকার স্তরের যারা, তাদের ট্র্যাডিশনের অবিসম্বাদী উত্তরাধিকারী। একটা প্রবাদ আছে, উত্তর কলকাতার বিখ্যাত খেলোয়াড় পাড়ার ছোকরারা বিশ বছর

আগেও স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের খ্যাতি শুনে পরস্পরের মধ্যে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিল—লোকটা কি জানি সব—বই-টই কি নেকে। বংশকুলুজী আলোচনা করলে দেখা যাবে এরা এই এদেরই মাসতুতো ভাইয়ের ছেলে। তাদের সঙ্গে এদের যে তফাৎ —সে তফাৎটা এক পুরুষের বা বিশ বছরের তফাৎ। তেরশো তিরিশ সালের পর থেকে দেশে যে হাওয়া বয়েছে, সেই হাওয়ায় নিশ্বাস নিয়ে ওরা বেড়ে উঠেছে, বাতাস থেকে রক্তে যে সব উপাদান বা শক্তি অথবা বিষ সঞ্চারিত হয়—তার মধ্যে বিষই হোক আর অমৃতই হোক—শক্তিই হোক—আর অনিষ্টকারী সাময়িক মত্ততাই হোক—দেশের ঐতিহাসিক ঘটনার প্রভাব তাদের পূর্ব্ব-পুরুষ থেকে স্বতন্ত্র ক'রে তুলেছে। তেরশো তিরিশের পর তের-শো বিয়াল্লিশ তারা চোখে দেখেছে। বিয়াল্লিশ বিপ্লবের সময় বয়সে ওরা আরও কাঁচা ছিল, এবং ছেচল্লিশ সালের কলকাতা —কলকাতা কেন—সারাদেশ—আর বিয়াল্লিশ সালের কলকাতা এবং দেশেও অনেক তফাৎ ছিল, তখন তারা কাঁচা বয়সে—সে কালের কলকাতায় শুধু সবিস্ময়ে দেখেছে সে দিনের বিপ্লব। মানুষকে গুলী খেয়ে মরতে দেখেছে, দলে দলে মানুষকে জেলে যেতে দেখেছে; মহাত্মা গান্ধী থেকে—সুভাষচন্দ্র—শরৎচন্দ্র—জয়প্রকাশনারায়ণ পর্য্যন্ত যাদের নাম শুনে তারা শুধু ভক্তি করত—তাদের তারা প্রত্যক্ষ চিনেছে সেই সময়ে। তেরশো পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ দেখেছে, মাটিতে মানুষ মরতে দেখেছে, আকাশে এরোপ্লেন উড়তে দেখেছে ঝাঁকে-ঝাঁকে, পথে মিলিটারী লরীর কনভয় দেখেছে, ট্যাঙ্ক দেখেছে, আর্মার্ড লরী দেখেছে, কামান দেখেছে, টমি গান, মেশিন গান দেখেছে, সাইরেণ শুনেছে, বোমা পড়তে দেখেছে, নিজেদের বাড়ীতে ঘরে—মেয়েদের অর্দ্ধউলঙ্গ দেখেছে,

বাঙালীর মেয়েকে W. A. C. I. সেজে ব্রিটিশ, এ্যামেরিকান, কাফ্রি—নিগ্রো—শিখ—পাঠানদের গায়ে—গা দিয়ে ঠোঁটে রঙ মেখে সিগারেট টানতে দেখেছে। আজাদহিন্দ ফৌজের বীরত্ব-কাহিনী শুনেছে, সুভাষচন্দ্রের নেতাজী নাম গ্রহণ করেছে, তাঁর বাণী শুনেছে—"তোমরা রক্ত দাও—আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব!" অন্ন বস্ত্রের অভাবে নিজেরা নিষ্ঠুর কষ্ট ভোগ করেছে, কালোবাজারের ভয়াবহতা উপলব্ধি করেছে, অসুখে ওষুদ পায় নি, মিছরী পায় নি, এক পয়সা দামের সিগারেট দু পয়সা তিনপয়সা দাম দিয়েও পায় নি। জয়প্রকাশের জেল ভেঙে পলায়ন কাহিনী শুনেছে, তার ধরা পড়ার কাহিনী শুনেছে, লাহোর জেলের নির্য্যাতন-কাহিনী শুনেছে। আবার রাজনৈতিক নেতাদের সগৌরব মুক্তির কথা শুনেছে, মুক্তিপ্রাপ্ত শরৎচন্দ্রকে স্বচক্ষে দেখে এসেছে হাওড়া ময়দানে। বৃটিশ এবং ভারতবর্ষ সম্পর্কে দেশ বিদেশের মতামত শুনেছে, দাম্ভিক—চার্চ্চিল সাহেবের পতনের কথা শুনেছে। দীর্ঘ ছ'বৎসরের এই সব ঘটনাবলীর ঘাত-প্রতিঘাতে দেশের এবং মানুষের পরিণতি সুস্পষ্ট রূপ নভেম্বর দেখেছে, শুধু দেখেছে নয়—কানুরা শেষের দিকে সে শোভাযাত্রার পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়েও ছিল। নেতাজী-জন্ম-দিবস পালন করেছে ২৩শে জানুয়ারী, ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা-দিবস পালন করেছে। ট্রাম ধর্ম্মঘট দেখেছে—তাদের ধর্ম্ম-ঘটের বিরাট সার্থকতায় আনন্দ উপভোগ করেছে।

ওদের কাছে এ সব ঘটনার প্রভাব এই ভাবের উচ্ছ্বাস—অত্যাচারের বিরুদ্ধে কঠিন আক্রোশ অত্যন্ত সাধারণ প্রবৃত্তির সামিল। এ সব ওদের কাছে আর রাজনীতি নামক—স্বতন্ত্র কোন তন্ত্র নয়, এ ওদের জীবন-তন্ত্রের সামিল। আজকার শোভাযাত্রার সংবাদ পেয়েও তারা তা উপেক্ষা করবে কি ক'রে?

একজন বললে—তা' হ'লে কোথায় ক'টার সময় একসঙ্গে হব বল ?

কানু বললে—দশটা থেকে সাড়ে দশটার মধ্যে, শ্যাম স্কোয়ারে।

একজন বললে—ও—কে।

সবাই বললে—ও—কে।

দল ভেঙে গেল। কানু বাড়ী ফিরছিল। নেবু বললে—সাড়ে দশটায় বেরুবে বুঝি।

কানু দাঁড়িয়ে—তার সামনের খানিকটা চুল ধরে টেনে দিয়ে বললে—সে খবরে তোর দরকার কি ?

নেবু বললে—তা তো বটেই। 'ব্যাটা ছেলে রাজা ছেলে খায় দুধের সর, মেয়েছেলে ছাই ছেলে—।"

—"যায় পরের ঘর।" নেবুর কথাটা কেড়ে নিয়ে কানু ছড়াটা শেষ করে দিয়ে বললে—নিশ্চয়।

ঘাড় নেড়ে নেবু বললে—হুঁ—তা তো বটেই। সরোজিনী নাইডু, অরুণা আসফ আলি, আমাদের পাড়ার কমলাদি, বীণা ঘোষ —এরাও তো ব্যাটাছেলে—না ? আহা—হা—কি আমার সব বীর ?

—মারব এক ঘুঁসি—দাঁত ভেঙে দোব তোমার!

—এস না, দেখি ! নেবু এগিয়ে আসছিল, হঠাৎ থেমে গেল, গলির মোড়ের ওপাশে গোপেনের উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে।

—ভারতের স্বাধীনতা কি রকম যে ভগবান জানেন—কিন্তু আমাদের মত লোকের স্বাধীনতা হল মরণ, বুঝলে বাবা।

কানু চলে গেল নিজের বাড়ীর দিকে। নেবু বললে—মা—বাবা আসছেন। গোপেন হন হন করে এসে বাড়ী ঢুকবার মুখে

থমকে দাঁড়িয়ে নেবুকে একটা ঠেলা দিয়ে বললে—এখানে দাঁড়িয়ে কেন ? এখানে ? স্নানের সব দিয়েছিস ?

সভয়ে বাপের দিকে চেয়ে নেবু বললে—এত সকালে—

—হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ। এত সকালে। ফের একটা ধাক্কা দিয়ে নেবুকে উঠানে ঠেলে দিয়ে গোপেন বাড়ী ঢুকে গেল। —তেল গামছা !

গায়ে-মাথায় জল ঢালবার সময়—বিশেষ করে শীতের দিনে গোপেন চীৎকার করে মন্ত্র বলে যায়। মন্ত্র নয়—লোকে বাইরে থেকে কথাগুলো কি বলছে বুঝতে না পেরে ভাবে মন্ত্র পড়ছে। হয়তো 'কুরুক্ষেত্রং গয়াগঙ্গা প্রভাস পুষ্করাণি চ পুণ্যান্যেতানি'—অথবা 'গঙ্গে চ যমুনে চৈব'—অথবা 'জয় ভগবান সর্ব্বশক্তিমান' এমনি ধারার কিছু। কিন্তু তা' নয়—গোপেন চীৎকার করে খুব তাড়াতাড়ি জড়িয়ে জড়িয়ে বলে "যে করে পাপ—সে হয় সাত বেটার বাপ ; যে করে পুণ্যি—তার ভাগ্য শূন্যি, তাকে লাগে শাপ-মণ্যি"—আরও অনেক নিজেই বানিয়ে বানিয়ে বলে। কবিত্ব-শক্তি ওর ছিল এমন নয়—একটুকু মিল করবার শক্তি মানুষ মাত্রেরই আছে।

আজ সে উঁচু দিকে মুখ তুলে উচ্চ চীৎকারে যা বলে চলেছিল, তার মধ্যে ছন্দ নাই মিল নাই—জীবনের যে কৌতুক-বোধটুকু রাত্রিতে বিশ্রামের পর সকালে মরসুমী ফুলের মত ফুটে ওঠে তা-ও নাই। সে বলছিল—মুখ তুলে ভগবানকেই সম্ভবত বলছিল—"মেরে দাও বাবা, মরে যাই, চুকে যাক্ আপদ। মরণের তো হাজার-দুয়ারী খুলেছ বাবা—ঝড়, বোমা, দুর্ভিক্ষ, কলেরা, বসন্ত, যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, নিমোনিয়া, হার্টফেল, টিটেনাস, মিলিটারী লরী, ট্রাম, বাস, বুলেট, বেয়োনেট, ছোরা-ছুরী, লাঠি

থেকে আম-কলার খোসা পর্য্যন্ত। তাই কর বাবা, কলার খোসায় পা-পিছলে ফেলে দাও কংক্রিট-করা ফুটপাথের উপর, নির্ঘাৎ মাথাটা ঠুকে চ্যালা করে দাও! ব্যাস্, ঝঞ্ঝাট মিটে যাক।"

স্নান শেষ ক'রেও তার ক্ষোভ মিটল না। ভাত হয়নি, বাসী রুটী থাকে ছেলেদের জলখাবারের জন্য; তাই গিলতে লাগল গুড় দিয়ে।

জেটী-সরকারের স্ত্রী তার অতীত অভিজ্ঞতা অনুযায়ী আজ ট্রাম বাস বন্ধ শুনে অনুমান করেছিল আজ সকালেই স্বামীকে রওনা হতে হবে, তাই সে ছেলেদের রুটী দেয় নাই। সকালে মধ্যে মধ্যে ছুটতে হয় গোপেনকে, সে দিন এই ব্যবস্থাই হয়ে থাকে। রুটী গিলতে গিলতে গোপেন মৃত্যু-কামনার জন্য সাফাই গাইছিল —"লাভ কি বেঁচে? আঠারো আনা লোকসানের বরাত, চল্লিশ টাকা মাইনেতে দশটা থেকে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত, জেটিতে ডকে ঘুরে মরে। পঙ্গপালের মত ছেলে। রাস্তার কুত্তার বাচ্চা সব। হবে না?" হঠাৎ স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে সে অত্যন্ত ঘৃণাভরে বললে—"মা-টা যে নেড়ী কুত্তী।" শান্তি এবার রূঢ় দৃষ্টিতে চাইলে স্বামীর দিকে। কিন্তু সে দৃষ্টি গ্রাহ্য করলে না গোপেন—সে বলেই গেল—"চাল ডাল বয়ে আনতে হবে আপিস থেকে, কাপড়ের জন্যে যেতে হবে কণ্ট্রোলের দোকানে; ঘণ্টার পর ঘণ্টা থাক শালা দাঁড়িয়ে। তবু তো শালা ব্ল্যাক-আউট ঘুচেছে আজ-কাল। ট্রামে-বাসে ঝুলতে ঝুলতে যাও বাদুড়ের মত। এক জোড়া স্যাণ্ডেল শালা পাঁচ টাকা। মার ঝাঁটা শালা বেঁচে থাকার মুখে। একটা গুলী আজ যদি বুকে লাগে—"

শান্তির আর সহ্য হল না, সে স্বামীর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে—"তুমিও বাঁচবে—আমিও বাঁচব!"

—"কি বল্লি ?"

শান্তি ভয় পেলে না, সে সরে গেল না, স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে রইল স্বামীর দিকে চেয়ে।

গোপেন বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। দরজার মুখে দাঁড়িয়ে হাতের কবচটা মাথায় স্পর্শ করলে, হাতে থাকে একটা রূপোর তৈরী পলার আংটী, সেটা স্পর্শ করলে দু ভ্রুর ঠিক মাঝখান-টিতে। তারপর হন্-হন করে রওনা হ'ল।

* * *

গলি গলি যাওয়া নিরাপদ। কিন্তু বড় রাস্তায় হয় তো এক আধখানা মাল-বওয়া লরী মিলতে পারে। ডকে কাজ ক'রে অনেক লরী-ড্রাইভারের সঙ্গে 'জান-পছান' মানে জানা-শোনা আছে।

শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার ফুটপাথ লোকে ভ'রে গিয়েছে। একেবারে কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। মজা দেখছে সব। দেখ বাবা। গোপেনের মজা দেখবার ভাগ্য নয়। হঠাৎ ঘণ্টা বাজিয়ে একখানা এ-এফ-এস মার্কা ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ী দ্রুত-বেগে এসে নিউ শ্যামবাজার ষ্ট্রীটে রাইমার কোম্পানীর ওষুধের দোকানের পাশে থামল।

কোথায় আগুন ? এখানে কোথাও আগুন লেগেছে না কি ? দাঁড়াল গোপেন। এ-এফ-এস লরীর নায়ক লরী থেকে নেমে এগিয়ে গেল রাস্তার ওপারে ফায়ার এলার্মের লোহার বাক্সটার দিকে।

হরি—হরি ! কেউ বদমাসী করে কাচের ঢাকনিটা ভেঙ্গে হ্যাণ্ডেলটা ঘুরিয়ে দিয়েছে। এদের হায়রাণ করার মতলব। আপন মনেই গোপেন বললে—"হুঁঃ !"

ছেলেগুলো লরীখানার দিকে এগিয়ে আসছে। একটা পনের-ষোল বছরের ছেলে সকলের দিকে চেয়ে বললে—"চল ভাই—লরীতে চেপে আমরা যেখানে আগুন লেগেছে সেখানে যাই।"

চেপে বসল সে। তার দেখাদেখি টপাটপ উঠতে আরম্ভ করলে ছেলেদের দল।——"সেণ্ট্রাল এ্যাভিনিউয়ে পৌছে দিতে হবে আমাদের। চালাও।"

ও বাবা! বিচ্ছুর দল রে বাবা! হ'ল কি?

ব্যাপারটা কি দাঁড়ায় দেখবার জন্য না দাঁড়িয়ে গোপেন পারলে না। চাকরীতে তাকে টানছে, কিন্তু এর আকর্ষণও অদম্য। ভয়ঙ্কর কিছুর ভূমিকা যেন তৈরী হচ্ছে লঘু কৌতুকের ভঙ্গিতে।

একটা ছেলে লরী ড্রাইভারকে বললে—"ওদিকে তাকাচ্ছ কি! পুলিশ নাই—ভেগেছে। চল—চল।"

এতক্ষণে গোপেনের খেয়াল হ'ল, পাঁচ মাথার মাঝখানে গোল জায়গাটার দিকে তাকিয়ে দেখলে—সত্যই সেখানে একজনও পুলিশ নাই।

লরীটা চলতে আরম্ভ করলে। নিউ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট ধরে পশ্চিম মুখেই চলেছে। একটু হাসি দেখা দিল গোপেনের মুখে।

* * *

হাটার বেগ ধীরে ধীরে বাড়ছে তার। পায়ের ডিমটা ক্রমশঃ শক্ত হয়ে উঠছে। এক-কালে গোপেন এনসাইজ করত; প্রথম আরম্ভ করত ধীরে ধীরে, তারপর সর্ব্বাঙ্গের মাস্‌ল্‌গুলো যত শক্ত হ'ত তত তার গতি বাড়ত। হেঁটে চলার মধ্যেও ঠিক সেই ব্যাপার।

আপিসের বাবুরা রুমালে বা ন্যাকড়ায় বাঁধা খাবারের কৌটো ঝুলিয়ে চলছে। ওদের দেখলেই চেনা যায়। গোপেন খাবার

নিয়ে যায় না। কুলোয় না। নেহাৎ যদি ক্ষিদে পায় সেদিন দু' পয়সার ছোলা-ভাজা কি ঘুঘনি-দানা আর এক কাপ চা খায়। দোকানের চা নয়; বড় পেতলের কেৎলী ভরে ভাঁড়ে ক'রে যারা পথের ধারে চা বিক্রী ক'রে—তাদের চা কিনে খায়। দু' পয়সায় এক ভাঁড়।

ফড়েপুকুরের মোড়ে বাদাম গাছটার তলায় এক-দল বাবু দাঁড়িয়ে আছে। গোপেন দেখেই বুঝলে এরা আফিসের বাবু নয়। এরা হ'ল খুচরো দালাল। বড় বড় আফিসের সঙ্গে এদের কারবার আছে, বড় সাহেব বড় বাবুকে খাতির এবং ভয় দুই-ই করে, তোষামদও করে—তবু দু-এক দিন আপিস কামাই করলে কৈফিয়ৎ দিতে হয় না। গোপেনের আপিসের থিয়েটার-পাগলা বন্ধুটি ওদের নাম দিয়েছে—'স্বাধীন জেনানা'। ওরা দাঁড়িয়ে আছে ট্রাম বা বাসের ব্যর্থ-প্রত্যাশায়। যদি হঠাৎ মিলে যায় কোনক্রমে—তবে আপিসে যাবে; নয় তো বাড়ী ফিরে আরাম করে ঘুম দেবে!

ওদিকের মোড়ে অর্থাৎ ফড়েপুকুরের দক্ষিণ মাথায় এক দল ছেলে ট্রাম-লাইনের সদ্য-তুলে-ফেলা পাথরের ইটগুলো নিয়ে রাস্তা বন্ধ করতে সুরু করে দিয়েছে।

বলিহারি বাবা! কাঠবেড়ালীরা ব্যারিকেড বানাচ্ছে।

জন-চারেক বড় ছেলে—পনের-ষোল বছরের কিশোর; হ্যাঁ—ভাল ভাল কেতাবে এদের কিশোরই বলে; জন-চারেক কিশোর রাস্তায় দু' মাথার পোষ্টের গায়ে দড়ি বেঁধে একটা পোষ্টার টাঙাচ্ছে।

"হিন্দু-মুসলমান ঐক্য চাই।"
"রাসদ আলির মুক্তি চাই।"
"রাজবন্দীদের মুক্তি চাই।"

একটা দেওয়ালের সামনে কয়েক জন জমেছে। খুব কৌতুকের সঙ্গে কি দেখছে। তাদের পাশ কাটিয়ে যাবার সময় গোপেনও থমকে দাঁড়িয়ে একবার উঁকি মেরে দেখতে চেষ্টা করলে ব্যাপারটা। এও একটা ইস্তাহার। ইংরেজীতে লেখা!

MAKE CALCUTTA

Nay, whole of India

Out of Bounds for

BRITISH IMPERIALISM

ঠিক হ্যায়। জিতা রহো ভাই!

বৃটিশ ইম্পিরিয়ালিজম কথাটা পড়েই গোপেনের মনের মধ্যে ভেসে ওঠে তার আপিসের বড় সাহেবের মুখ! বড় সাহেবের মুখ মিলিয়ে গিয়ে ভেসে ওঠে এক জন পুলিশ সার্জেণ্টের মুখ। উৎসাহিত হয়ে উঠল গোপেন। শালা! অভ্যাস মত বেরিয়ে পড়ল কথাটা।

মেতে উঠেছে—ক্ষেপে উঠেছে কলকাতার ছেলের দল। মোড়ে মোড়ে ওদের আয়োজন চলছে। গোপেনের চোখে ওদের চেহারা পাল্টাচ্ছে। মনে মনে বার বার বলছে—'বহুৎ আচ্ছা—জিতা রহো'!

বিডন ষ্ট্রীটের মোড়ে এসে—গোপেনের মনটা একেবারে পাল্টে গেল। ছেলের দল একটা মোটরকে আটকেছে।

—নামো, গাড়ী থেকে নামো! আর গাড়ী চড়ে যেতে পারে না।

—আগুন লাগিয়ে দাও ! লাগাও আগুন ।

গোপেনের বুকের ভেতরটা নেচে উঠল সঙ্গে সঙ্গে । 'লাগাও আগুন' ধ্বনিটা বুকের ভেতরে হাজার খিলান-ওয়ালা ইমারতের মত প্রতিধ্বনি তুলেছে । তার মনে পড়ে গেল—মোটরের সামনে কত বার অতর্কিতে পড়ে সে চমকে উঠেছে, ড্রাইভারের ধমক খেয়েছে, গালাগাল খেয়েছে, কত বার তার জামা-কাপড়ে কাদার ছিটে লেগেছে ।

গাড়ী থেকে নামল একটি সায়েবী পোষাক-পরা ভদ্রলোক । বললে—দেখ আমি ডাক্তার । রোগী দেখতে যাচ্ছি । চার-পাঁচ জায়গায় যেতে হবে । গাড়া না গেলে কি ক'রে আমি এদের দেখব বল ? পায়ে হেঁটে কি দেখা সম্ভবপর ?

—ডাক্তার আপনি ?

প্যাণ্টের পকেট থেকে ষ্টেথিস্কোপ বার করলে ভদ্রলোক ; বললে—গাড়ীর কাচেও লেখা আছে দেখ !

—কিন্তু আপনি সায়েবী পোষাক পরেছেন কেন ?

হেসে ডাক্তার বললে—টাই পরিনি, দেখ, গলায় টাই নাই । তবে নানা ধরণের রোগী দেখি, ছোঁয়াচ বাঁচাতে ঢিলে কাপড়-জামায় অসুবিধা হয় ।

—আচ্ছা । যান আপনি ।

—না । দাঁড়ান ।

—আবার কি ?

—বলুন—বন্দে মাতরম্ ।

—বন্দে মাতরম্ ।

—বলুন—জয় হিন্দ্ ।

—জয় হিন্দ্ !

—বলুন—রসিদ আলির মুক্তি চাই।

—নিশ্চয়। রসিদ আলির মুক্তি চাই।

—বলুন, রাজবন্দীদের মুক্তি চাই।

—রাজবন্দীদের মুক্তি চাই।

—আচ্ছা, যান আপনি।

ডাক্তার মোটরে চড়ল, চড়বার সময়ে সে নিজেই বললে—বন্দে মাতরম্! জয় হিন্দ্!

প্রত্যুত্তরে ছেলেদের সাড়া দেবার সময় ছিল না। আর একখানা মোটর আসছে।—রোখো—রোখো। হাতে হাত বেঁধে ওরা নিজেরাই ব্যারিকেড হয়ে দাঁড়িয়েছে।

—নামো—উতারো।

গাড়ীর ভিতরে মেয়েছেলে নিয়ে এক ভদ্রলোক রয়েছেন। হঁ—লাগাও, এইবার লাগাও, ভাল ক'রে লাগাও! এক হাত ক'রে সোনার গয়না ঝকমক করছে, চুড়ি কঙ্কণ;—কি বলে—কি নাম যেন আর একটা হালফ্যাশানে গয়নার?—চূড়, হ্যা চূড়। আরও আছে নাম জানে না গোপেন! মেয়েদের পরনে শাড়ী জামা ঝলমল করছে; তলহাত রাঙ্গা টকটক করছে, গায়ের চামড়া আপেলের মত চকচকে। চলেছে মোটরে চড়ে। উতরে দাও। দাও নামিয়ে! লাগাও আগুন মোটরে। হাঁ—হাঁ, লাগাও!

ভদ্রলোক নেমে বললে—খুব জরুরী কাজে যাচ্ছি বাপু! দেখছ না—মোটরে মেয়েছেলে রয়েছে।

—ও সব আমরা শুনব না।

শুনো না, কখনও না। কভি নেহি!

দূর থেকে একটা আওয়াজ শোনা যাচ্ছে দক্ষিণ দিক্ থেকে একখানা গাড়ী আসছে। হুডখোলা মোটর; মোটরের উপর

দাঁড়িয়ে মেগাফোন দিয়ে কারা কি বলছে! পতাকা উড়ছে গাড়ীখানায়। তেরঙ্গা ঝাণ্ডা কংগ্রেস পতাকা! গাড়ীখানা এসে দাঁড়াল।

বন্দে মাতরম্!
জয় হিন্দ্!
বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ—
ধ্বংস হোক্!
হিন্দু-মুসলমান—
এক হোক্।

লেগে গেল মাতন। গোপেনের অন্তর যেন নাচছে।

* *

খানিকটা ক্ষুব্ধ হল গোপেন। পতাকা উড়িয়ে মেগাফোন নিয়ে যারা এল, তারা ওই মোটরের ভদ্রলোক এবং মেয়েছেলেদের গাড়ীখানা ছেড়ে দিলে; সামনে এগিয়ে যেতে অবশ্য দিলে না, কিন্তু গাড়ীতে চড়িয়ে বাড়ী ফিরিয়ে দিলে। বললে—ওঁরা আমাদেরই মা-বোন—ওঁদের অসম্মান করলে কার অসম্মান হবে? তাছাড়া এ ভাবে আমাদের কাজ করলে চলবে না। আমাদের নিজেদের লোকের অসম্মান করে, মোটর পুড়িয়ে—ক্যাপ্টেন রসিদ আলির মুক্তি হবে না। গত কাল পুলিশ যে উদ্ধত হিংস্র বর্ব্বরতা দিয়ে আমাদের উপর নির্য্যাতন করেছে—বাধা দিয়েছে—তারও কোন প্রতিকার হবে না। এ বিষয়ে আমাদের কি কর্ত্তব্য স্থির করবার জন্য আমরা আজই বেলা বারোটার সময় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে সমবেত হয়ে মিটিং করব। হিন্দু-মুসলমান নেতারা সেখানে আসবেন। তাঁরা আমাদের নির্দ্দেশ দিবেন। অত্যাচারীর উগ্র দাম্ভিকতার উপযুক্ত উত্তর আমরা দেব। প্রয়োজন হয় আমাদের

৩

বুকের রক্তে ভাসিয়ে দেব কলকাতার রাজপথ। পিছু হটব না আমরা। সুতরাং আপনারা এই ভাবে কাজ না করে দলে দলে চলুন ওয়েলিংটন স্কোয়ারে। লক্ষ লক্ষ মানুষ সমবেত হয়ে আজ আমরা অগ্রসর হব। দেখি কোন্ শক্তি আমাদের গতিরোধ করতে পারে! চলুন—চলুন—দলে দলে সব ওয়েলিংটন স্কোয়ারে চলুন। এমন ভাবে পথ বন্ধ করে কোন কাজ হবে না।

বন্দে মাতরম্! জয় হিন্দ্! ইনকিলাব-জিন্দাবাদ! চলুন, দলে দলে চলুন ওয়েলিংটন স্কোয়ারে। ছেড়ে দাও; রাস্তা ছেড়ে দাও ভাই। ওঁদের বাড়ী ফিরে যেতে দাও। যান—আপনারা বাড়ী ফিরে যান। কোন কাজের অজুহাত আজ শুনব না আমরা। যান—ফিরে যান।

মোটর-ড্রাইভার মোটরের মুখ ঘুরিয়ে দিচ্ছে। না হোক যাওয়া—বেঁচে গিয়েছে, খুব বেঁচে গিয়েছে।

হঠাৎ গোপেনের কি হল। সে দুই হাত তুলে চীৎকার করতে করতে এগিয়ে এল।—কভি নেহি! রোখো গাড়ী!

সকলে সবিস্ময়ে তাকালে তার দিকে।

গোপেন বললে—মেয়েছেলেরা গাড়ীতে যাক, কিন্তু ওই ভদ্রলোককে নামতে হবে। হেঁটে যেতে হবে।

ছেলের দল আবার ক্ষেপে উঠল। মুহূর্তে তারা মোটরটাকে ঘিরে দাঁড়াল।—নামতে হবে। মেয়েরা যাক মোটরে, ওঁকে হেঁটে যেতে হবে।

মেগাফোনধারী এক জন ভদ্রলোক এ গাড়ী থেকে নেমে বেষ্টনী ভেদ করে এদের গাড়ীর দরজার হ্যাণ্ডেল ধরে দাঁড়িয়ে বললে—আপনি নামুন মশায়। আপনাকে হেঁটেই ফিরতে হবে। নামুন। নামুন। দেরী করবেন না!

ভদ্রলোক নামলেন। খুসী হয়ে উঠল গোপেন। অত্যন্ত খুসী হয়ে উঠল।

গোপেন চেঁচিয়ে উঠল—জয় হিন্দ্‌।

ছেলেরা সমস্বরে প্রতিধ্বনি তুললে—জয় হিন্দ্‌!

গোপেন চলতে আরম্ভ করলে এবার। খুব জোরে হাঁটছে সে।

ছেলেরাও চলছে। এক জন চেঁচিয়ে উঠল—চলো—চলো!

সকলে বললে—দিল্লী চলো।

এক জন গান ধরলে—কদম কদম বাঢ়ায়ে যা—!

ঠিক হ্যায়। গোপেনও তাদের সঙ্গে গান ধরলে—খুসীসে, গীত গায়ে যা।

* * *

দু' ধারের দোকান-পাট সব বন্ধ।

ইট কাঠ লোহার কলকাতা যেন দাঁতে দাঁতে টিপে মুখ বন্ধ করে শুষ্ক দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে; থম থম করছে। রুদ্ধ মুখ—শুষ্ক দৃষ্টি কলকাতার অন্তরের মধ্যে যা হচ্ছে তারই খানিকটা ছিটকে বেরিয়ে এসে রাজপথ বেয়ে চলেছে। মাণিকতলার মোড় থেকে লোক চলছে সেণ্ট্রাল এ্যাভিন্যুর দিকে।

—লাগ গিয়া, আগুন লাগা দিয়া।

থমকে দাঁড়াল গোপেন। মোড় ফিরল সে। সেণ্ট্রাল এ্যাভিন্যুর দিকেই চলল। লরীর প্রত্যাশা মিছে। যেতে হবে হেঁটেই। সেণ্ট্রাল এ্যাভিন্যু ধরে আফিস কাছে হবে। গত রাত্রের সেণ্ট্রাল এ্যাভিন্যুর ভয়াবহ অভিজ্ঞতার স্মৃতি সে বিস্মৃত হয় নাই, রাত্রির অন্ধকারে জলন্ত লরীর আগুনের আভায় মানুষগুলির সে মুখ তার মনের মধ্যে জ্বল্‌ জ্বল্‌ করছে। তফাৎ শুধু

গত রাত্রের সে আতঙ্ক তার আর নাই। গাদাবন্দী বাসন পাথরের মেঝের উপর ঝন্ ঝন্ করে পড়লে—অন্য বাসনেও তার সুর বাজে, কিন্তু সে বাসনে যদি জিনিষ কিছু থাকে তবে সে ইট-পাথরের মতই শব্দহীন হয়ে পড়ে থাকে। তার বুকের বাসনে কাল ছিল ভয়ের বোঝা, সকালেও ছিল চাকরীর ভাবনার বোঝা—যেন সব খালি হয়ে গিয়েছে। হন্ হন্ করে সে চললো।

ফট-ভট-দুম-দুম!

আরম্ভ হয়ে গিয়েছে! সেণ্ট্রাল এ্যাভিন্যুর মুখে এসে সে দাঁড়াল। কোন্ দিকে শব্দ উঠছে? উত্তর দিক্‌টা চঞ্চল হয়ে উঠেছে; গলিতে গলিতে লোক ঢুকে যাচ্ছে। হাঁ—ওই—ওই আসছে লরী। চলন্ত লরীর লোহার বেড়ায় বুক দিয়ে দাঁড়িয়ে বন্দুক ছুঁড়ছে। সার্জ্জেণ্ট পুলিশ—গুর্খা পুলিশ।

চমকে উঠল গোপেন।

মাথার উপর থেকে ঠিক তার পাশেই সশব্দে খসে পড়ল কার্ণিশের খানিকটা অংশ, আধখানা ইটসমেত পলেস্তারা। বন্দুকের গুলী এসে লেগেছে ওখানে।

ওই চলে আসছে লরী। ওই!

লোকেরা গলিতে সেঁধিয়ে পড়ছে। গোপনেও ফিরল; কিন্তু হঠাৎ ক্ষিপ্রগতিতে ঘুরে ভাঙ্গা ইটের টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে ছুটে ঢুকে গেল মাণিকতলা ষ্ট্রীটের পাশের একটা গলিতে।

সশব্দে লরীটা বেরিয়ে যেতেই উদ্যত হাতে ইটটা নিয়ে ছুটে সে বেরিয়ে গেল সেনট্রাল এ্যাভিন্যুর দিকে।

শালাঃ!—দাঁতে দাঁতে টিপে রইল। ইটখানা লাগে নি। সর্ব্বাঙ্গে ঘাম ঝরছে। বুকের ভেতরটা যেন ঢেঁকি দিয়ে কুটছে।

লোক ছুটছে উত্তরমুখে গ্রে ষ্ট্রীটের দিকে।

কিছুক্ষণ সে ভাবলে। দক্ষিণ-মুখে টানছে খিদিরপুর ডক। জাহাজ বোঝাই হচ্ছে। কিন্তু—! উত্তর দিকে লোক দলে দলে ছুটছে। পুলিশ গুলী চালিয়ে এল। তবে কি? ঘুরল গোপেন উত্তরমুখে। ওই যে একটা জনতা!

নীলমণি মিত্র ষ্ট্রীট সেণ্ট্রাল এ্যাভিনু্য জংসন।

জনতার বেষ্টনী ভেদ করে ঢুকল সে। কাউকে সে ভ্রূক্ষেপ করলে না! যাকেই সে ঠেলে পথ করে নিলে—সে-ই ক্ষুব্ধ হয়ে ফিরে তাকালে তার দিকে। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা, তার মুখের দিকে তাকিয়েই সে তাকে পথ ছেড়ে দিলে। গোপেনের মনেও এ নিয়ে কোন প্রশ্ন উঠল না। অবসরও ছিল না। সমস্ত লোককে কাঁধে ধরে পিছনে পাশে সরিয়ে সে ভিতরে গিয়ে দাঁড়াল।

রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে একটি ছেলে। ছেলে মানুষ।

এখনও গল গল করে রক্ত বার হচ্ছে।

—দত্তদের ছেলে। মনোরঞ্জন—মনোরঞ্জন দত্ত।

স্থিরদৃষ্টিতে গোপেন চেয়ে রইল ছেলেটির দিকে। সব গুলিয়ে যাচ্ছে গোপেনের, বুকের ভিতরে একটা আগুনের শিখা পাক খেয়ে ঘুরছে!

* * *

একটা ইট এসে মাথায় লাগল। রাস্তার ওপার থেকে কেউ ছুড়েছে। শালাঃ! বাঁ দিকে কানের ইঞ্চি-দুয়েক উপরে। রাস্তার আলোগুলো চরকীর মত পাক খাচ্ছে। বাঁ হাত দিয়ে ক্ষত স্থানটা চেপে ধরে সে বসে পড়ল। হাতের তালুতে ঠেকল যেন আগুন। আগুন নয়—আগুনের মত গরম রক্ত; হাতের তালু ছাপিয়ে কানের দু'পাশ দিয়ে গড়াচ্ছে। একজন তাকে ধরে নিয়ে গেল পাশের গলির মধ্যে।

এইবার তার যেন সম্বিৎ ফিরল।

রাত্রি হয়ে গেছে। কত রাত্রি বুঝতে পারলে না। নীলমণি মিত্র ষ্ট্রীট—সেন্ট্রাল এ্যাভিন্যু জংসনে মনোরঞ্জনের রক্তাক্ত দেহের সম্মুখে সে দাঁড়িয়েছিল। তারপর কি ঘটেছে স্পষ্ট তার মনে নাই। আবছা-আবছা মনে পড়ে—লাখে লাখে লোক; ডালহৌসী স্কোয়ার!

একটা ঘটনা মনে পড়ছে।

লাখে লাখে লোক চলেছে। বউবাজার ষ্ট্রীট। মানুষের ধ্বনিতে কলকাতার রাস্তার দু'পাশের ইট কাঠ লোহার তিনতলা চারতলা বাড়ীগুলো কাঁপছে, মাথার উপরে দূর আকাশে উড়ন্ত চিলগুলো বোধ হয় চমকে উঠছে, তাদের ছাড়িয়েও ভগবানের দোরে গিয়ে প্রতিধ্বনি তুলছে। মানুষের পায়ে সে কি বল—সে কি স্ফূর্তি জেগেছে! চলেছে তারা ডালহৌসি স্কোয়ার প্রদক্ষিণ করে যাবে। হঠাৎ এল একখানা পুলিশের লরী। জনতা ক্ষেপে উঠল। গোপেনই সর্ব্বপ্রথম লাফ দিয়ে গিয়ে লরীর কিনারা চেপে ধরলে। তার সঙ্গে আরও কত জন। ভেঙ্গে ফেলবে, পুড়িয়ে ফেলবে লরীখানা। এ কি অত্যাচার! হয়েও যেত একটা কাণ্ড। পুলিশ ফায়ার করলে। বুলেট নয়। টিয়ার গ্যাস। ওদিক থেকে নেতারা ছুটে এলেন। কাণ্ড কিছু হ'ল না, কিন্তু টিয়ার গ্যাসের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠল গোপেন। চোখে সে কি যন্ত্রণা, নিশ্বাসে সে কি কষ্ট!—আঃ—আঃ—আঃ! কোথা থেকে প্রচুর জল এসে পড়ল গোপেনের মাথায়। বাঁচল যেন গোপেন। উপরে তাকিয়ে দেখলে দোতালা তেতালা থেকে মেয়েরা জল ঢালছেন! আঃ! দীর্ঘ জীবনী হও! জয় হোক তোমাদের। জয় ভারত মাতা!

ভারতমাতার মেয়েদের কিন্তু ভাল ক'রে দেখতে পেলে না গোপেন! সচল জনতার অজগরের দেহের একটি ত্বকের মত গতির টানে এগিয়ে যেতে হল।

ডালহৌসি স্কোয়ার ঘুরেও কিন্তু গোপেনের ক্ষোভ মিটল না। এ যে কি ক্ষোভ—এ যে কি বুকের আগুন—সে অন্যে বুঝতে পারবে না। ভারতবর্ষীয়—বাঙালী—কলকাতার বাঙালী না হ'লে অন্যে বুঝতে পারবে না। গোপেনের সম অবস্থার লোক হলে আরও ভাল বুঝতে পারবে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা কি তা গোপেন জানে না কিন্তু তার নিজের স্বাধীনতায় আর মৃত্যুতে কোন প্রভেদ নাই। সেই স্বাধীনতার জন্য সে ক্ষেপে উঠেছে। সে ঘুরল কিছুক্ষণ সেণ্ট্রাল এ্যাভিন্যুয়ে। মাতামাতি চলছিল সেখানে।

হঠাৎ তার কানে এল কালীঘাটে ভীষণ কাণ্ড চলছে। জগুবাজার হাজরার মোড় সে একেবারে ভয়ানক করে তুলেছে। কংগ্রেসের লরী গিয়েছিল হাঙ্গামা বারণ করতে—লরীখানা পুড়িয়ে দিয়েছে।

গোপেন চৌরিঙ্গীর মাঠে মাঠে গাছের তলায় তলায় সে কালীঘাটের দিকে ছুটেছিল। জগুবাবুর বাজারে জোর কাণ্ড-কারখানা চলছে। সেণ্ট্রাল এ্যাভিন্যুয়ে লরী পোড়ানোর মধ্যে পূরো তৃপ্তি পাচ্ছে না সে। ছুটল দক্ষিণ-মুখে কালীঘাট—কালীঘাট—জগুবাবুর বাজার!

মনে পড়ছে হাজরা রোডের উপর দাউ-দাউ করে আগুন। একখানা লরীর পেট্রোল-ট্যাঙ্ক সেই মুহূর্ত্তে ফেটে জ্বলন্ত পেট্রোল রাস্তার উপর ছড়িয়ে পড়ল। দেওয়ালী-কা রাত, ইয়া—দেওয়ালীর রাত বানিয়ে নিলে। মনে পড়ছে—ওদিক থেকে গুর্খারা বন্দুক হাতে হাঁটু গেড়ে বুকে হেঁটে এসেছে। মধ্যে মধ্যে গুলীর

ঝাঁক ছুটে আসছে। মানুষ পড়ছে। অ্যাম্বুল্যান্সের লরী আসছে, সাদা পোষাক পরা দেশী ডাক্তারেরা তুলে নিয়ে যাচ্ছে তাদের। জিতা রহো, জিন্দাবাদ! ডাক্তার ভাইরা।

আবছা-আবছা মনে পড়ছে সব। ইটটা কিন্তু জোর হাঁকড়েছে। এখনও রক্ত ঝরছে। শালা ঝোঁক কাটিয়ে দিলে, হুঁস ফিরে এল।

কালীঘাট ট্রাম-ডিপোর সামনে সে দাঁড়িয়েছিল। সামনেই।

ডিপোর ভিতরে ট্রাম পুড়ছে। দেওয়াল টলছে। মনে পড়ছে আগুন দেওয়া। ডিপোর দেওয়াল টপকে ভিতরে লাফিয়ে পড়ছে সব, হাতে জ্বলন্ত মশাল। মানুষের সর্ব্বাঙ্গটা দেখা যায় না, বুক থেকে মুখ পর্য্যন্ত দেখা যায়—জ্বলন্ত মশালের আলোয় লালচে হয়ে উঠেছে। বাখারী—ছোট লাঠির মাথায় মবিল পোট্রোল দিয়ে ভিজানো জুট-কটন বেঁধে জ্বেলে নিয়েছে। দাউ দাউ করে জ্বলছে। একটার পর একটা মশাল পাঁচীলের উপর উঠছে আবার পড়চে নীচে লাফিয়ে। সে-ও লাফিয়ে পড়েছিল তাদের সঙ্গে।

বেরিয়ে এসে দেখছিল রোশনাই। ধাঁ ক'রে এসে লাগল ইটটা। গলির ভিতর থেকে মাথায় ফেটী বেঁধে সম্বিৎ নিয়ে সে ফিরল।

খুব জ্বলছে ট্রাম ডিপো।

একটা ছেলে—গলির মুখ থেকে গান গেয়ে উঠল—

বসন্তে ফুল গাঁথ-লো—আমার জয়ের মা-লা—

আগুন জ্বালা—আগুন জ্বালা—

সিনেমার গান। গোপেন গানটাকে সিনেমার গান বলেই জানে। রেডিওতেও ঐ গানটা প্রায় বাজায়। বহুৎ আচ্ছা ছোকরা! ঠিক গান ধরেছে!—

আগুন জ্বালা—আগুন জ্বালা—

গাইতে গাইতে ফিরল গোপেন। কালীঘাট থেকে বাগবাজার। কুছ-পরোয়া নাই। ভয় নাই; ডর নাই; মুখে—কানের পাশে রক্তের দাগ, গায়ের জামায় রক্ত; হাতে পোড়ানো লরী থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া এক টুকরো লোহা—তা ছাড়া কলকাতা-শুদ্ধ লোকই তো আজ দোস্ত। ক্লান্তিও নাই—আশ্চর্য্য—পা ভেরে যাচ্ছে না আজ। হন হন করে সে চলল। ওই গানটা গাইতে গাইতেই সে ফিরল।

কালীঘাট থেকে বাগবাজার। চলো মুসাফের। হুঁসিয়ারী শুধু মিলিটারীকে। লাট সাহেব আজ সন্ধ্যেয় না কি মিলিটারী বসিয়েছে রাস্তায় রাস্তায়। গলি-গলি চলো!

আগুন জ্বালা—আগুন জ্বালা—

(তিন)

সাড়ে আটটা বেজে গিয়েছে। এখনও অগাধ ঘুমে ঘুমুচ্ছে গোপেন। আজ আর তার স্ত্রী তাকে ডাকে নাই। গত কাল গভীর রাত্রে রক্তমাখা জামা গায়ে দিয়ে, মাথায় একটা দগ্‌দগে ক্ষত চিহ্ন নিয়ে ফিরে যে তাণ্ডব সে করেছে, তার পর আর ঘুমন্ত গোপেনকে ডেকে জাগাতে সাহস হচ্ছে না শান্তির। গোপেনের স্ত্রীর নাম শান্তি। কুম্ভকর্ণের ঘুমিয়ে থাকাই ভাল। ঘুম ভাঙালেই সে বেরুবে, এবং আজ বেরুলে সে আর ফিরবে না—এই তার দৃঢ় ধারণা। এক দিনে গোপেন কুম্ভকর্ণের মতন ভীষণ হয়ে উঠেছে। ওর এই ঘুম দেখে শান্তির মনে কুম্ভকর্ণের উপমাটা জেগে উঠল—নইলে কাল রাত্রে ধারণা হয়েছিল সে পাগল হয়ে গিয়েছে।

গোপেনের রক্তমাখা মূর্তি দেখে শান্তি শিউরে উঠেছিল। শিউরে ওঠা দেখে গোপেনের সে কি উল্লাস! সে কি হাসি! হাসি থামিয়ে গান গেয়ে উঠল—আগুন—জ্বা—লা—আগুন—জ্বা—লা!

—ওগো! ওগো! শান্তি ভীত শঙ্কিত হয়ে তাকে ডেকেছিল!

উত্তরে গোপেন গান থামিয়ে চিৎকার করে উঠেছিল জয়—হি-ন্দ্! ইনকিলাব জিন্দাবাদ! ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদ—বর, বা—দ! ইয়া!

সুস্থ মানুষ অকস্মাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে যেমন শঙ্কিত হয় সকলে, চিরদিনের অসুস্থ মানুষ হঠাৎ সুস্থ হয়ে উঠলেও সকলে তেমনি শঙ্কিত হয়, বিভ্রান্ত হয় অন্ততঃ। চিরটা কাল গোপেন রাত্রিতে ফিরে শান্তিকে—ছেলেগুলোকে তিরস্কার করে' প্রহার করে; মধ্যে মধ্যে জিনিষ-পত্র ভাঙে। ফিরবার সময় তার সাড়ে আটটা থেকে ন'টার মধ্যে; কোন ক্রমে যেদিন সাড়ে ন'টা হয়, সে দিন আগে থেকেই শান্তি প্রস্তুত হয়ে থাকে। সে দিন গোপেনের মেজাজ হয়—দু'ডিগ্রির কাছাকাছি উত্তাপের জ্বরগ্রস্ত রোগীর মত। সমস্ত কিছু প্রলাপ-চিৎকারের অন্তরালে থাকে তার শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন মনের বিলাপের সকরুণ পরিচয়। কাল ফিরেছিল রাত্রি দু'টোয়; প্রথমেই শান্তির গালে মেরেছিল প্রচণ্ড এক চড়। তারপর সে এক তাণ্ডব। নিজের কপালে করাঘাত করেছিল, মৃত্যু কামনা করেছিল; ঘুমন্ত বড় ছেলেটার গায়ের লেপ খুলে যাওয়ায় সে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়েছিল, তাকে একটা লাথি মেরেছিল। আজ সকালেও সে যখন কাজে বেরিয়েছে, তখনও সে নিজের মৃত্যু কামনা করেছে, ছেলেগুলোকে 'রাস্তার কুত্তার বাচ্চা' নামে অভিহিত ক'রে তাদের মৃত্যু কামনা করেছে। শান্তির দিকে সে হিংস্র পশুর মত

দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল, সে দৃষ্টি শান্তির চোখের উপর ভাসছে। সেই মানুষ ফিরল সাড়ে আটটার জায়গায় রাত্রির শেষ প্রহরে, কপালে দগদগে ক্ষত, সর্ব্বাঙ্গে রক্তের দাগ নিয়ে; আজ তো তার বীভৎস ক্রোধে, উন্মত্ত প্রলাপে, অন্তরাত্মার আর্ত্তনাদে বাড়ীটাকে প্রেতপুরী বানিয়ে তুলবার কথা! সে মানুষ এমন উল্লাস নিয়ে ফিরল কি ক'রে? এমন সন্তোষের প্রাণখোলা হাসি হাসে কোন্ যাদুর স্পর্শে? তবে কি সে পাগল হয়ে গিয়েছে? শুধু হেসেই ক্ষান্ত হয় নাই গোপেন, উল্লসিত চিৎকারে জয় হিন্দ ইনকিলাব জিন্দাবাদ বলেই ক্ষান্ত হয় নাই, সে শান্তিকে মিষ্ট কথা বলেছে, সমাদর করেছে, ঘুমন্ত ছেলেগুলোর দিকে তাকিয়ে প্রত্যাশার কথা বলেছে, গুন্-গুন্ করে গান গেয়েছে, এই সব হাঙ্গাম চুকে গেলে এক দিন ভাল করে খাওয়া-দাওয়া করতে হবে বলেছে, ভেটকী, গল্‌দা চিংড়ী, মাংস, সন্দেশ—অনেক কিছুর ফর্দ্দ করেছে মুখে মুখে। দক্ষিণেশ্বর কালী-বাড়ী গিয়ে মা কালীর পূজো দিয়ে আসবার মানত করেছে। শান্তিকে বলেছে, তাঁতের কাপড় কিনে দেবে। বলতে বলতেই সে ঘুমিয়ে পড়েছে। শান্তির ঘুম আসে নাই। এই পাড়াতেই আছে এক পাগল—সে রাস্তার লোক পেলেই তাকে ধরে বলে—"ওই যে বেলুড়ের রাজা—মহারাজ রামকৃষ্ণের বংশধর—রাজ্য ওদের পাওনা নয়। বুঝলে—মানে স্বত্বদোষ হয়েছে। স্বত্ব হ'ল আমার। এইবার আমি রাজা হব। রাজ্য পেলেই তোমাকে একটা বড় চাকরী দেব। মোটর আমি কিনব না, কিনব এরোপ্লেন—আর জুড়িগাড়ী। ঘোড়া—খুব বড় বড় তেজী ঘোড়া। টগো-বগ্, টগো-বগ্, এই তফাৎ যাও, হট যাও—হট যাও!" বলতে বলতে সে নিজেই ছুটতে থাকে। শান্তি এক দিন দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল, তাকেও সে সবিনয়ে এসে কথাগুলি শুনিয়ে গিয়েছিল।

তার কথা ও কল্পনার সঙ্গে গোপেনের কথা ও কল্পনার তফাৎ কোথায় ? তফাৎ শুধু এক জায়গায়—পাগলের কথা শুনে সে অপার কৌতুক অনুভব করেছিল—প্রাণভরে হেসেছিল। আর গোপেনের কথা শুনে সে নিদারুণ আশঙ্কায় প্রায় শ্বাসরোধী উদ্বেগ অনুভব করেছে ; নিঃশব্দে বাকী রাত্রিটুকু কেঁদেছে।

সকাল বেলায় তাই সে গোপেনকে ডাকলে না। ছেলেগুলোকে চিৎকার করতে নিষেধ করলে। ঘরের জানালা দু'টো শীতের রাত্রে বন্ধই থাকে, সকাল বেলায় খুলে দেওয়া হয়, আজ তাও খুললে না। দরজাটা ভেজিয়ে দিলে।

মানুষের শরীরে কত সয় ? দুঃখী গরীব হলেও ওরও তো মানুষের শরীর ! বেচারী ঘুমিয়ে সুস্থ হোক্। ঘুমই হ'ল মায়ের কোল। শীতের দিনে গরম, গ্রীষ্মের দিনে বাতাস—মায়ের হাতের স্পর্শ। বড় ছেলেটাকে পাঠাবে বাজারে, ওই গিয়ে বাজার ক'রে আনুক।

রাস্তা-ঘাটের এই অবস্থা ! গুলী চলছে। এই বস্তীর মধ্যে বাড়ীতে বসেও শান্তি খবর পাচ্ছে। ছেলেরা খবর আনছে, প্রতিবেশীরা খবর আনছে, পথে লোক চলছে—তাদের মুখে এই ছাড়া কথা নাই, পানের দোকানের সামনে এই কথা চলছে, গঙ্গার ঘাটে এই কথার জটলা, আকাশে এই কথা—বাতাসে এই কথা ; আশপাশের বাড়ীতে কেউ কাতরে উঠলে মনে হচ্ছে—কেউ বুঝি গুলী খেয়ে বাড়ী ফিরল, কান্নার আওয়াজ শুনলে মনে হচ্ছে—ও-বাড়ীর কেউ রাস্তায় গুলী খেয়ে মরেছে, এল বুঝি সেই খবর। এই বস্তীটায় ঘরে ঘরে মেয়েরা অভিশম্পাৎ দিচ্ছে। তাদের ভদ্র-গৃহস্থদের পাশেই—ঝি-চাকরের কাজ যারা করে, মজুর খেটে যারা খায়, তাদের বস্তী ; এই বস্তী থেকে ঝিয়ের দল সকাল বেলায়

বেরিয়ে যায়—কেউ তিন বাড়ী, কেউ চার বাড়ী ঠিকের কাজ করে। এই বাগবাজার থেকে শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার মোড় পার হয়ে, নতুন রাক্ষুসে বড় রাস্তাটা পার হয়ে অনেক দূর পর্য্যন্ত কাজ করতে যায়। ওদিকে হাতিবাগানের মোড় পর্য্যন্ত, এদিকে খাল-ধার পর্য্যন্ত, অন্য দিকে কুমোরটুলী আহিরীটোলা শোভাবাজার পর্য্যন্ত। কাল বিকেল বেলা থেকে কেউ আর কাজে বার হ'তে পারে নাই। গলি-গলি যত দূর যাওয়া যায় গিয়ে বড় রাস্তা যেখানে পড়েছে সেখান থেকেই ফিরে এসেছে। আজও ভোর বেলায় কয়েক জন বেরিয়েছিল। এ-পাড়ার জগো মাসীর প্রবীণ বয়স, পাড়ার ঝিয়েদের একটা দলের মুরুব্বী। সে ভোর বেলায় শ্যামবাজারের মোড় পর্য্যন্ত গিয়ে পালিয়ে এসেছে। আর যেতে সাহস হয় নাই। কালীঘাটের বাসগুলো যেখানে দাঁড়ায় সেইখানে একটা বড় বাড়ীতে লালমুখো গোরা-পল্টন গিস-গিস করছে। দোতলা তেতলার বারান্দায় সারি সারি দাঁড়িয়ে ঝুঁকে দেখছে। রাস্তা-ঘাট যেন তেপান্তরের মাঠ,—ট্রাম নাই, বাস নাই, গাড়ী-ঘোড়া, রিক্সা—কিছু নাই; মিলিটারী লরী যেগুলো পাড়া কাঁপিয়ে সকাল বেলা কারখানার বাবুদের, ফিরিঙ্গী মেমসায়েবদের আনতে যায় সেগুলো পর্য্যন্ত আজ বন্ধ। মোড়ের উপর বন্দুক ঘাড়ে ক'রে লালমুখোরা টহল দিচ্ছে। বাজার-হাট দোকান-পাট সব বন্ধ। তবুও জগো রাস্তাটা পার হবার চেষ্টা করেছিল। ঠিক রাস্তার মাঝ বরাবর গিয়েছে, এমন সময় একটা বিকট আওয়াজ উঠল—হি—! চমকে উঠে জগো দেখলে—একজন লালমুখো তার দিকেই আঙুল দেখিয়ে চেঁচাচ্ছে—হি—। এক জন তাকে দেখালে বন্দুকটা। অন্য কেউ হলে সে সেইখানেই পড়ে যেত। কিন্তু জগো—জগো মাসী বলেই কোন রকমে ছুটে পালিয়ে এসেছে। তার পালানো দেখে তাদের

সে কি অট্টহাসি! এটা আমোদ হল ওদের। জগো বুঝতে পারলে সে কথা। কিন্তু আমোদ করতে ওরা অনেক কিছু করতে পারে। জগোর মনে পড়ল—বাগবাজারের মাঠে ছেলের দলের ইন্দুর মারার কথা। একটা দোকানের মেঝে থেকে পঁচিশ-তিরিশটা ইন্দুর বেরিয়েছিল—সেগুলোকে ঘিরে ওই মাঠে তাড়া করে তারা ঠেঙিয়ে মারছিল। সে কি আমোদ তাদের। জগো ফিরে এসেছে। যারা যাচ্ছিল, তাদের ফিরিয়ে এনেছে। যারা যাবার উদ্যোগ করছিল, তাদের বারণ করেছে। দল বেঁধে বসে তারা এখন অভিশম্পাৎ দিচ্ছে। ভগবান্‌কে ডাকছে। বলছে বিচার করো তুমি।

কাল রাত্রেই না কি একটা প্রকাণ্ড বড় ট্যাঙ্ক এনে শ্যাম-বাজারের বাজারের পিছনে কোথায় রেখেছে। ট্যাঙ্ক দেখেছে শান্তি। রাস্তার উপর দিয়ে যেতে দেখেছে। দুনিয়ায় এমন ভয়ঙ্কর জানোয়ারও নাই। বাঘের পা আছে, মুখ আছে, চোখ আছে, হাতীরও আছে, গণ্ডারেরও আছে। কিন্তু এর পা নাই—রাস্তা কাঁপিয়ে—বাড়ী কাঁপিয়ে—বিকট শব্দ করে বুকে হেঁটে চলে—চোখ নাই—সুমুখ নাই—পিছন নাই—বেরিয়ে আছে কামানের নল। ওই চালাবে আজ। মানুষের বুকের উপর দিয়ে চালিয়ে দেবে। পিষে—দ'লে—মানুষের রক্তমাংস চটকে দিয়ে চালাবে। ওই রাক্ষুসে পাঁচ মাথার মোড়ে কত মানুষকে চাপা দিলে, তার হিসেব নাই। সেগুলো তবু মোটর—বড় বড় দৈত্যদানার মত আকার হলেও রবারের চাকা। আজ এই কয়েক বৎসর ধরে ওই এক আতঙ্কের উদ্বেগ নিত্য নিয়মিত ভোগ ক'রে আসছে শান্তি। ছেলেগুলো বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেই উদ্বেগটা জাগতে আরম্ভ করে, ফিরতে যত দেরী হয়—তত সে উদ্বেগ বাড়ে। রাস্তায়

মানুষ চাপা পড়ার খবর এলেই মনে হয় এবার উদ্বেগে হৃৎপিণ্ডটা ফেটে যাবে। গোপেনের জন্য তার এ ভাবনা ছিল না। মনে হয়, বড় ছেলেটা বুঝি চাপা পড়েছে। কিন্তু আজ তার ভাবনা গোপেনের জন্য। কাল রাত্রে সে গোপেনের যে মূর্তি দেখেছে, তাতে সে আজ নিঃসন্দেহ হয়েছে যে, গোপেন আজ পাঁচ মাথার মোড়ে যাবামাত্র ওই ট্যাঙ্কটার তলায় পড়ে পিষে—চটকে—রক্তেমাংসে হাড়ের কুচিতে ছেত্‌রে রাস্তার পিচের উপর সেঁটে যাবে, পানের দোকানের সামনে পিচে সেঁটে বসে যাওয়া সোডা-ওয়াটারের বোতলের মুখের পিতলের ঢাকনীর মত, না—ঢাকনীটা বসে গেলেও গোটাই থাকে; সেঁটে যাবে দুপুরের রৌদ্রে গলা পিচের উপর উড়ে-পড়া শুকনো পাতার মত।

জগোর উচ্চ কণ্ঠস্বর এখনও শোনা যাচ্ছে। অভিশম্পাতের ভাণ্ডার তার ফুরিয়ে গিয়েছে বোধ হয়; কিন্তু আক্রোশ মেটে নাই। ভগবান্‌কে বিচার করতে বলেছে, কিন্তু তাতেও বোধ হয় ভরসা রাখতে পারছে না। কবে অভিশম্পাৎ ফলবতী হবে, কবে ভগবান্ বিচার করে দণ্ড দেবে—তার প্রতীক্ষা করে থাকবার মত ধৈর্য্যও আর নাই। জগো উচ্চকণ্ঠে বলছে—আপশোষ হচ্ছে আমার—ছুটে পালিয়ে এলুম কেনে? গুলী করে মারত—মারত, মরতাম, ফুরিয়ে যেত, যন্ত্রণার শেষ হত, খালাস পেতাম।

এক জন উত্তর করলে—মরণকে তো ভয় নাই দিদি; গুলী লেগেও যদি না মরি, একটা অঙ্গ যদি খোঁড়া হয়ে যায়—ভয় তো সেই।

অন্য এক জন বললে—মেরে ফেলায় সে তো চুকে-বুকে যায় মাসী। মুখপোড়ারা যে ধরে নিয়ে যায় গো। বেপদ তো সেইখানে।

তার কথাকেই সমর্থন করে আর এক জন বললে—মাগো! বাঁশবুকোরা মোটর গাড়ীতে যায় আর ইশারা করে ডাকে। গাড়ী থেকে ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে ধরতে যায়।

—এই সে-দিন! আর এক জন বলে উঠল—সে-দিনে সন্‌জে বেলায় ভোলা দাসী কাজ সেরে বাড়ী ফিরছে—গলিটির মুখে ঢুকবে, পিছু থেকে কেঁউড়ি মেউড়ি শুনে ফিরে চেয়ে দেখে দু'জনা তাকে ডাকছে—পিছু নিয়েছে। ভোলা দাসী দে ছুট ভয়ে। ভোলা দাসীও ছোটে—তারাও ছোটে। খালের ধার—পথে লোকজন নাই, সন্‌জে হয়ে গিয়েছে—কি বিপদ বল দিকিনি? ভোলা দাসীর অদৃষ্ট ভাল, ধরতে পারলে না—তার আগেই গলিতে ঢুকে একটা বাড়ীতে সেঁদিয়ে গেল। লোকজন দেখে মুখপোড়ারা আর আসে নাই।

হঠাৎ অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে জগো বলে উঠল—চল্, কেনে আমরা সব দল বেঁধে যাই, রাস্তায় দাঁড়িয়ে বলি—লাও দাগো বন্দুক —মেরে ফেলাও আমাদিগে লাও—মার—লাও।

* * *

ঘুমুক। কাল কাজে না গিয়ে এই মাতনে মাতা-মাতি করে রাত্রির শেষ প্রহরে ফিরেছে। আজও সে আপিস কখনই যাবে না, যাবে ওই মাতনে মেতে উঠবার জন্যে। চাকরী গেলে এতেই যাবে। তবে প্রাণে না ম'রে বেঁচে যাতে থাকে তাই করতে হবে শান্তিকে।

বাড়ীতে এক টুক্‌রো আলু নাই, এক ফালি কুমড়ো নাই, শাকের পাতা পর্য্যন্ত নাই। কাল গিয়েছে হরতাল। বাজার বসে নাই। শান্তি নিজেই বাজার করে। গোপেন আপিস গেলে সে যায় গঙ্গার ঘাটের দিকে। পথে বাগবাজারের বাজার।

ফুটপাথেও ফড়েরা তরকারী বিক্রী করে। সবই প্রায় দাগীধরা জিনিষ কিন্তু দরে সস্তা। আজ এখনই—এইক্ষণে বাজার না করলে চলবে না; রান্না চড়বে না। পয়সার জন্য ভাবনা নাই। গত কাল ওই যে বড় বাড়ীখানা—ওই বাড়ীর ঝি এসে আধ সের চিনি এক সের মুগের ডাল কিনে নিয়ে গিয়েছে। ঝিটা নিজের জন্যে কিনেছে আধ-পো নারকেল তেল। পয়সা আছে। কিন্তু গোপেনকে বাড়ীতে রেখে শান্তির বাইরে যেতে সাহস নাই। ভালবাসা ভক্তি—এ-সবের কথা নয়, কথাটা হল নেহাৎ সাদা কথা, গোপেনের কিছু হলে এই বাচ্চাগুলোকে নিয়ে দাঁড়াবে কোথা? জায়গা অবশ্য পাশেই রয়েছে ওই জগোদের বস্তীর এলাকায়, মেপে দেখতে গেলে তফাৎ মাত্র বিশ হাত, কিন্তু ওই বিশ হাত পার্থক্য অতিক্রম করবার কথা মনে করতেও শান্তি শিউরে ওঠে। ওরা খারাপ লোক বলে নয়; রাত্রে অবশ্য ওখানে অনেক খারাপ কাণ্ড ঘটে। চেঁচামেচি, মারধর, হল্লা, গালা-গাল অনেক কিছু হয়। মেয়েদের অনেকেই খারাপ। তবে তারা বাজারের বেশ্যা নয়, জানা চেনা লোক দু'-চার জন আসে যায়। ওদের পাশেই অনেক গেরস্তও থাকে। বামুন-কায়েত-বদ্যি সব রকম জাতই আছে। বামুনের মেয়েরা সকাল বেলা গামছা ঢেকে থালা নিয়ে ঠিকের রান্না করতে যায়। রোজগারও বেশ করে। বামুনের মেয়ে আধবুড়ী ওই 'টিয়েপাখী'—ও না কি রোজগার করে মাসে পাঁচশ টাকা। লম্বা হিলহিলে চেহারা টিয়েপাখীর মত নাক আর অনর্গল বকে; পাখীতে যেমন শুনে বুলি বলে তেমনি ভাবে যে যা বলবে ঠিক সেই কথাটি নিজে একবার বলবে, তাই ওকে লোকে বলে টিয়েপাখী। ঠিক ওই জন্যেই শান্তি ওই টিয়েপাখীর অবস্থার কথা ভাবলে শিউরে ওঠে। সে বেশ জানে, টিয়েপাখী যে ওই ভাবে পরের কথাটি

অবিকল বলে যায়, সেটা তার পরের তোষামোদ করার প্রয়াস। দু'-বাড়ীতে ঠিকের রান্না ক'রে মাইনে পায় পঁচিশ টাকা আর তোষামোদে তুষ্ট ক'রে পুরনো কাপড় থেকে আরম্ভ করে ছেঁড়া জুতো পর্য্যন্ত সংগ্রহ করে। টিয়েপাখীর একটি মেয়ে আছে তার স্বামী কাজ করে কারখানায়, মাইনে যা পায় তার অর্দ্ধেক যায় নেশায়! কাজেই টিয়েপাখীকে জোগাতে হয় মেয়ের কাপড় থেকে আরম্ভ ক'রে নাতনীর ফ্রক, জুতো, খেলার জন্যে ভাঙ্গা পুতুল পর্য্যন্ত। মধ্যে মধ্যে চুরিও করে। চুরি করে আনে কয়লা, ঘুঁটে, বাটা মসলা, পান, দোক্তা পর্য্যন্ত। ওই দশায় উপনীত হতে শান্তি পারবে না। এই বিশ হাত তফাৎ অতিক্রম করার চেয়ে, বৈতরণীর খেয়া-পার হ'তে সে রাজী! ঘুমুক, গোপেন ঘুমুক!

গোপেন দেখতে কুৎসিত। আসলে এমন কুৎসিত সে ছিল না, কিন্তু বসন্তের দাগে মুখখানা বিশ্রী করে দিয়েছে, গোপেন যখন রাগে, তখন ওই ক্ষত-চিহ্নে ভরা মুখখানা ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। ঘুমন্ত গোপেনের মুখের দিকে চেয়ে আজ কিন্তু শান্তির মন মমতায় ভ'রে উঠল। ওকে একটু ভাল খেতে দেওয়ার প্রয়োজন, যত্ন করার প্রয়োজন। ওই তো গোটা সংসারের ভরসা। কিন্তু যত্ন করবে কখন! বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই মানুষের। শান্তি হঠাৎ উঠল। ডাকলে বড় ছেলেকে—দেবা! দেবা!

দেবুর সাড়া নাই। শান্তি বেরিয়ে এল বাড়ী থেকে। গলিটার বাঁক পর্য্যন্ত দেবা নাই, মেজ ট্যাবাটাও নাই। সাত বছরের তৃতীয় ছেলে হাবুটা দাঁড়িয়ে আছে বাঁকের মাথায়। শান্তি তাকেই ডাকলে—হাবা! দেবা কই, ট্যাবা কই?

দিগম্বর ছেলেটা অনবরত সর্ব্বাঙ্গ চুলকাচ্ছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে হাবা বললে—মেড্ডা গেল "ডয়হিণ্ড" করটে। ডাড্ডাও গেল।

জয় হিন্দ করতে? শান্তির সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে গেল। ওই মেজ ট্যাবাটা হল তার গর্ভের আপদ। খুদে শয়তান! ওরই জন্যই পাড়ার লোকের সঙ্গে ঝগড়া। পাড়ার ছেলেকে ঠেঙিয়ে আসবে। চোর হয়েছে, চুরি করবে। ভোরে অন্ধকার থাকতে উঠবে, বাড়ীর দরজা খুলে বেরিয়ে, যার সঙ্গে ঝগড়া তার বাড়ীর দরজাটাকে পায়খানায় পরিণত করে দিয়ে আসবে। সরস্বতী পূজোর ভাসান দেখতে চলে গিয়েছিল হাওড়া পোলের ধার পর্য্যন্ত। শেয়ালদার কাছে মেলা বসে মুসলমানদের পর্ব্বে—সেখানে চলে যাবে। হাতীবাগানে বোমা পড়েছিল, সেখানে গিয়েছিল। তখন তো আরও ছোট ছিল। গ্রে ষ্ট্রীটে একটা বোমা পড়েছিল—পড়েই সেটা ফাটে নাই, পুলিশ থেকে গাড়ী ঘোড়া ট্রাম লোক যাতায়াত বন্ধ রেখেছিল—ট্যাবা সেইখানে বসেছিল সমস্ত দিন। সমস্ত দিন পরে সন্ধ্যায় ফিরে এসে হতাশ ভাবে বলেছিল—বোমাটা ফাটল না। আপদ। ওটাই তার জীবনের সব চেয়ে বড় আপদ! 'ডাক-পুরুষের' কথায় আছে,—'আগলাগুলা যেখানে যায়, পিছলাগুলাও সেখানে ধায়'; ট্যাবা সে কথাকে রদ করেছে, উল্টে দিয়েছে, ট্যাবা যায় আগে দেবা যায় পিছনে; ট্যাবাই মাটি করলে দেবাকে। মরুক—মরে তো ট্যাবাই যেন মরে। ট্যাবার খোঁজে মাঝে মাঝে তাকে নিজেকে বার হতে হয়। কিন্তু আজ আর তার বার হবার উপায় নাই। ট্যাবা যায় যাক্, দেবাও যদি তার সঙ্গে মরে মরুক, আজ সে গোপেনকে ছেড়ে এক পা নড়বে না। সে ডাকলে—নেবু।

নেবু হ'ল বড় মেয়ে, সব চেয়ে বড় সন্তান। চৌদ্দতে পা দিয়েছে লম্বা হয়ে উঠেছে তার মাথার সমান। ভারী শক্ত মেয়ে। শান্তির সন্তানদের মধ্যে ওই সব চেয়ে সবল—শক্ত। ছেলেবেলায় মেয়েদের খেলাধুলায় সব-কিছুতে ফার্ষ্ট হ'ত। লেখা-পড়াতেও ভাল

ছিল। কিন্তু মাইনে কোথা থেকে আসবে, বইয়ের দাম কে দেবে। নেবু ঘরের কাজ করে আর বাপের তাড়ায় গান শেখে। কোন কালে গোপেন একটা হারমোনিয়ম পেয়েছিল লটারীতে, সেটা ভেঙে এত দিন পড়েছিল—হঠাৎ একদা গোপেন সেটাকে মেরামত করিয়ে এনে নেবুকে দিয়েছে। বলেছে—গান শেখ। মধ্যে মধ্যে নাচ শিখতেও বলে। গোপেনের ধারণা—নাচ-গান জানলে বিয়ের পক্ষে সুবিধে হবে। শান্তি ডাকলে—নেবু।

—বাসন মাজছি।

—থাক বাসন, আমি গিয়ে মাজছি। তুই শোন্।

নেবু এসে দাঁড়াল। একটা হাফ প্যাণ্ট আর বাপের ছেঁড়া একটা কামিজ গায়ে দিয়ে কোন মতে লজ্জা নিবারণ করেছে। শান্তির চোখে ওটা খুব লাগে না, দেখে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। শান্তি বললে—তুই আজ বাজারটা ক'রে নিয়ে আয়।

—বাজার ?

—হ্যাঁ। একটা আলু পর্য্যন্ত নাই। দেখ, এই বাগবাজারের বাজারে কি পাস, নিয়ে আয়। ভাল দেখে চিংড়ী আনবি এক পোয়া। তোর বাপ চিংড়ী খেতে ভালবাসে। আর কাপড়টা পরে নে। এক ফালি কুমড়ো, একপো আলু। একটু বড় দেখে আনবি। গলদার দর বেশী—বড় বাগদা আনবি বরং। আর পথে যদি ট্যাবা-দেবার দেখা পাস—তবে নিয়ে আসবি। বলবি—মা বলেছে মুখে রক্ত তুলে দেবে আজ। তাতে না শোনে—তবে একটা পথের পাথর তুলে কপালে মেরে ফাটিয়ে দিয়ে আসবি—আমি তোকে বলছি—ফাটিয়ে দিয়ে আসবি।

অত্যন্ত সাহসী মেয়ে নেবু আর এই ধারার কাজে ভারী খুসী হয় সে। ব্লাউজ তার নাই, আছে গোটা দুয়েক খাটো ফ্রক।

ফ্রকটাকে প'রে তার ওপর পড়লে সে মায়ের কাপড়খানা। বাজারের থলিটা হাতে বেরিয়ে গেল। আবার ফিরল সব চেয়ে ছোট ভাইটাকে টানতে টানতে। বছর তিনেক বয়েস ওটার, ওটার বাতিক হ'ল সিগারেটওয়ালার দোকানের সামনে থেকে লেমনেড সোডার বোতলের মুখের টিনের ঢাকনী সংগ্রহ করা। বললে —নাও এটাকে। ট্যাবা আর দ্যাবা শুনলাম—পাড়ার ছেলের সঙ্গে দল বেঁধে বেরিয়েছে। লরী পোড়াতে গেছে।

নেবু আবার চলে গেল।

শান্তির ইচ্ছে করছিল এই ছোটটাকে মেরে খুন ক'রে ফেলে। কিন্তু না;—চিলের মত চেঁচাবে। গোপেনের ঘুম ভেঙে যাবে।

উনোনের আগুনটা দেখতে হবে। চায়ের বন্দোবস্ত ঠিক করে রাখতে হবে। পোয়াটেক চিনি এখনও আছে ঘরে—খানিকটা ভিজিয়ে রেখে দেবে, সারা রাত জেগেছে একটু সরবৎ খেলে শরীরটা ঠাণ্ডা হবে। আহা রে, বড় ভুল হয়ে গেল, অন্ততঃ একটা নেবুর জন্য বললে হ'ত। অনেক দাম। অন্ততঃ চার পয়সা। কিন্তু তার মেয়ে খুব চালাক একটা নেবুর পয়সা লাগত না। নেবু-লঙ্কা-আমড়া এ সব সংগ্রহে নেবুর নিপুণতা অদ্ভুত।

জগো এখনও চীৎকার করছে।

* * * *

শান্তি দু'হাতে দু'টো গেলাস নিয়ে একটা থেকে অন্যটায় সরবৎ 'ঢাল-উপুড়' করে চিনিটাকে গলিয়ে ফেলছিল। উনোনটা ধরে উঠেছে। সরবৎটা রেখে এইবার ডাল চড়িয়ে দেবে। একটা গোলমাল শুনে সে চমকে উঠল। হাতের কাজ তার বন্ধ হয়ে গেল। সে কান পেতে শুনবার চেষ্টা করলে। অনেক লোক একসঙ্গে উত্তেজিত কণ্ঠে কথা বলছে। গেলাস দু'টো নামিয়ে

রেখে সে দ্রুতপদে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল গলির মোড়ে। এক লোক বেরিয়ে গেল। জয় হিন্দ—ইনকিলাব জিন্দাবাদ! গিয়া রে বাবা। চলো মুসাফের।

সামনে রহমান সেখের বিড়ির কারখানা। রহমান দোকান বন্ধ করেছে। রহমানকে শান্তি চেনে, কিন্তু কথা বলে না। শান্তি মিনিট খানেক দ্বিধা করলে, তার পর সে রহমানকেই ডাকলে—কি হয়েছে বলুন তো?

রহমান ফিরে তাকিয়ে শান্তিকে কথা বলতে দেখেও বিন্দুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করলে না; উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে বললে—শ্যামবাজারে পাঁচ মাথায় গুলী চালিয়েছে।

—গুলী চালিয়েছে? শ্যামবাজারের পাঁচ মাথায়?

—হ্যাঁ; সাত-আট আদমী গিয়েছে।

—আমার ট্যাবা-দেবা—

রহমন যেতে যেতে বললে—দেখব আমি। ট্যাবা খুব হুঁসিয়ার আছে, আপনি ভাববেন না। সে চলে গেল।

শান্তি কয়েক মুহূর্ত্ত দাঁড়িয়ে রইল স্তব্ধ হয়ে। তার পর সে বেরিয়ে পড়ল। গোপেনকে সে ডাকবে না। ছেলে দু'টো—হেন্ আর সাবুটা থাকল, থাক। তাকে যেতেই হবে। শ্যামবাজারের পাঁচ মাথায় সাত-আটটা লোক পড়েছে, তার মধ্যে ট্যাবা আর দেবা নিশ্চয় আছে। ট্যাবা হয় তো বাঁচলেও বাঁচতে পারে, দেবা যে আছে তাতে আর কোন সন্দেহ নাই; দেবা বোকা। তার বুদ্ধি কম। ছুটল শান্তি।

দেবা কি ট্যাবা যদি মরে থাকে তবে শান্তি আজ সামনে পেলে ওদের উপর লাফিয়ে পড়বে। মারুক—ওকেও তারা গুলী করে মেরে ফেলুক।

শ্যামবাজারের পাঁচ মাথা।

ফুটপাথ ঘিরে চারি পাশে জনতা। এত মানুষ—তবু স্তব্ধ। রাস্তাটা ফাঁকা; জনশূন্য পিচ পাথরের পথ মানুষ ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া নদীর মত ভয়াল মনে হচ্ছে। ফুটপাথের জনতা পাড়ের মানুষের মত—ওই তরঙ্গে ঝাঁপ দেবে কিনা ভাবছে।

উত্তরে পুলিশ ব্যারাকটার বারান্দায় শাদা মানুষগুলো ঝুঁকে দেখছে। সম্ভবতঃ ঘৃণা, আক্রোশ এবং ক্রোধ-পরিপূর্ণ অন্তরে কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখছে—কালা আদমীদের।

শান্তি ভিড় ঠেলে সামনে এসে দাঁড়িয়ে চারি দিক চেয়ে দেখছিল। কোথায় দেবা [illegible] গুলী খাওয়া রক্তে ভেসে যাওয়া শরীর। গল-গল ক'রে [illegible] পড়ছে গুলীর ছিদ্র দিয়ে!

কে তার কাপড় ধরে টানলে পিছন থেকে!

কে রে? কে রে সয়তান—হারামজাদা—

—আমি। নেবু।

—নেবু!

হ্যাঁ।

—তুই এখানে?

—চারটে লোককে গুলী ক'রলে এক্ষুণি। আমি দেখললাম।

—চার জন?—দেবা—ট্যাবা?

—তারা এখানে নাই। আমি ওদিকের বাজারে যাইনি। এখানে এসেছিলাম। বললে—গোরা পল্টন এসেছে। তাই—। নির্ভয় হাসি হাসলে নেবু।—চল বাড়ী চল।

—দেবা-ট্যাবা নেই এখানে? যারা গুলী খেয়েছে তাদের তুই দেখেছিস্?

—হ্যাঁ। একজন সারকুলার রোড থেকে আসছিল—কাদের বাড়ীর চাকর—তার লেগেছে। একজন যাচ্ছিল সাইকেলে চড়ে

তার লেগেছে। আরও দু'জনের লেগেছে। সব হাসপাতা
নিয়ে গেছে! এস।

হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল জনতা। বন্দুক উঁচিয়ে লরী-বোঝা
নিষ্ঠুর-দর্শন মানুষ আসছে। এক-কালে ওদের সাদা রঙ বিস্ময়ে
উদ্রেক করত মানুষের, মনে হ'ত কত সুন্দর ওরা। আজ মানুষে
মনের আয়নার পিছনের পারা পালটে গিয়েছে। এখন সেখানে
ওদের মুখের যে ছবি ফুটে ওঠে, তাতে নিষ্ঠুরতা মাখানো, ওদে
নীল চোখের প্রতিবিম্বের মধ্যে দেখা যায় হৃদয়হীন হিংসা, ঘৃণা।

নেবু টেনে নিয়ে এল ভিড়ের পিছনে। চল বাড়ী চল।

—দেখি একটু দাঁড়া।

আর গুলী চালানো দেখতে পেলে না শান্তি! ফিরল।

বাড়ীর দুরজা খোলা। ঘর শূন্য। গোপেন নাই। তার
জামা নাই, জুতো নাই। কয়েকটি মেয়ে দাঁড়িয়েছিল উদ্‌গ্রীব
হয়ে। —কি হ'ল গো? তুমি যে ছুটে গেলে! দেবা না ট্যাবা?

নেবু চীৎকার করে উঠল—ও কি কথা?

লোকে যে বলছে মা। তোমার মা ছুটে গেল। তোমার মায়ের ছুটে
যাওয়া দেখে তোমার বাবাকে ডেকে দিলে। বাবা তোমার ছুটে গেল।

শান্তি পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল।

নেবু বললে—বাবাকে দেখব মা?

কথা বলতে পারল না শান্তি; ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিলে।—
দেখ! দেখে আয় যা।

নেবু ফিরে এল অনেকক্ষণ পর।—না, বাবাকে পেলাম না।

দেবা-ট্যাবাও ফেরে নাই।

জগো গালাগাল দিচ্ছে। কাঁদছে। জগোর ভাই এসেছে
এই মরণ-তাণ্ডবের মধ্য দিয়ে ছুটতে ছুটতে। জগোর ভাই [illegible]

যে বাড়ীতে—সেই বাড়ীর একটি চৌদ্দ বছরের মেয়ে গুলী লেগে মারা গিয়েছে। জগোই ও-বাড়ীতে এক-কালে কাজ করত, নিজের ভাইকে জগো ও-বাড়ীতে চাকরী করে দিয়ে নিজে এখন ঠিকের কাজ করে। ওই মেয়েটিকে সে দশ বছর বয়স পর্য্যন্ত কোলে-পিঠে ক'রে মানুষ করেছে। মেয়েটি বসেছিল তে-তলার ঘরে—সেইখানেই গুলী-বিদ্ধ হয়েছে। বিক্ষুব্ধ উন্মত্ত জনতার ইট-পাটকেলের মধ্যে লরী থামিয়ে নেমে মুখো-মুখী গুলী চালাতে সাহস করে নাই। চলন্ত লরী থেকে গুলী ছুড়েছে—সেই গুলী এসে লেগেছে মেয়েটিকে। চৌদ্দ বছরের ফুলের মত মেয়ে।

জগো ছুটে বেরিয়ে গেল।

—মাসী, তুমি আর যেয়ো না বাছা এর মধ্যে। মাসী।

—মরব। আমিও মরব। ওরে আমার নিজের হাতে মানুষ করা রে।—বুক চাপড়াচ্ছে জগো।

জগোর ভাইও বলছে—আয়, আয়, একবার দেখবি না? আয়। মরণ তো একবার ছাড়া দু'বার হয় না। আয়। বন্দুকের গুলীকে আর ভয় নাই—আয়। বাচ্চা মল'—জোয়ান মল'। বুড়ো মল'—কুলী মল'—মজুর মল,—বাবু মল'—ভাই মল', আয়—। চলে আয়। মরব। চলে আয়!

শান্তি সেই থেকে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে।

জগোর ভাই খবর নিয়ে এল। শান্তির তো ভাই নাই; না থাক—দেবা-ট্যাবা দুই ভাই গিয়েছে, দেবা মরলে ট্যাবা খবর আনবে, ট্যাবা মরলে দেবা আসবে কাঁদতে কাঁদতে।

আসছে, আসছে—দু'জনের এক জন আসছে। কিন্তু গোপে-নের তো ভাই নাই! শান্তিও জগোর মত বেরুবে না কি?

চার

বুধবার ১৩ই ফেব্রুয়ারী। দিন শেষ হয়ে এল। শান্তি স্তব্ধ হয়ে বসে আছে; গোপেন বেরিয়ে গিয়েছে—তার ফেরার কথা নয়, দেবা-ট্যাবাও ফেরে নাই। সে ভাবছে দু'টোই কি মরেছে? না হ'লে তো একটা অন্তত ফিরত কাঁদতে কাঁদতে। পাড়ার ছেলেগুলোর অনেক ফিরেছে। নেবু তাদের সন্ধান ক'রে এসেছে। তারা বলেছে—'সেই সকাল বেলাতেই তাদের সঙ্গে ওদের ছাড়াছাড়ি হয়েছে। তার পর আর তারা ওদের খবর জানে না।' হুঁসিয়ার মেয়ে নেবু, খুঁটিয়ে খবর এনেছে। গ্রে ষ্ট্রীটে একটা রেশনের দোকানের সামনে লোক জমায়েৎ হয়। দোকান ভেঙ্গে লুঠ করে নেবার জন্য দরজা ভাঙবার চেষ্টা করে। পুলিশের লরী এসে পড়ে। গুলী চালায়। গোলমালের মধ্যে যে যেদিকে পেরেছে ছুটে পালিয়েছে। ওদের দলে ছিল এগার জন। পাঁচজন এক দিকে পালিয়েছিল—তারাই ফিরেছে। বাকী ছ'জনের মধ্যে দেবা-ট্যাবা ছাড়া চারজনের নাম ঠিকানা নিয়ে নেবু তাদের খবরও করেছে। চার জনের দু'জন ফিরেছে। তারা বলেছে—ওরা ছ'জনেই একসঙ্গে ছিল। গ্রে ষ্ট্রীট থেকে গলি-গলি ওরা পালিয়ে যায়। হেদোর ধারে গিয়ে খবর পায়—মাণিকতলা বাজারের ওখানে খুব কাণ্ড চলছে। সেখানে গিয়েছিল ওরা। সেইখান থেকে দেবাদের সঙ্গে তাদের ছাড়াছাড়ি হয়েছে।

নেবু বললে—সেখানে নাকি বিস্তর লোক। হাঙ্গামার দরুণে। দু' তিন হাজার লোক রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। গাড়ী এসে দাঁড়ালেই বোঁ বোঁ করে ইট ছুঁড়ছে। পুলিশ ও মিলিটারী লরী এলেই সব যে যার গলিতে ঢুকে পড়ছে। লরীও চলতে আরম্ভ করছে; বাস্, গলি থেকে বেরিয়ে আবার বোঁ-বোঁ করে ঢেলা।

শান্তির আর এ সব শুনবার ধৈর্য্য ছিল না—সে চীৎকার ক'রে বলেছিল—বোঁ-বোঁ ক'রে ঢেলা, বোঁ-বো করে ঢেলা! শুনতে আমি আর পারছি না নেবু। ওরা মরেছে—এই খবরটা এনে দিতে পারিস?

এই কথাটা শান্তির মুখেও নতুন নয়, নেবুর কানেও নতুন নয়; আজ তিন বৎসর ধরে, অর্থাৎ যত কাল মিলিটারী লরীর চাকায় আর গোঙানীতে কল্‌কাতা কাঁপছে—ততকাল মাসে অন্তত তিন-চার দিন এই কথাটা বলে আসছে শান্তি। নেবুকেই বলে আসছে। কিন্তু আজকার কথাটা যেভাবে মা বললে—সে ভাবে আর কখনও বলে নাই। নেবুর সকল উৎসাহ নিভে গেল। সে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে বললে—আর একবার দেখব মা?

—না। তোমার জন্যে আর আমি ভাবতে পারব না।

নেবুও কম নয়। মেয়ে হয়ে জন্মেছে তাই রক্ষা, বেটাছেলে হলে এত দিন ও চুরি করত, গাঁট কাটত, আরও অনেক কিছু করত। বাজার থেকে নেবু লঙ্কা চুরি ক'রে আনে, ফিরি-ওয়ালীর ডালা থেকে জিনিষ তুলে নেয়; সেদিন কন্‌ট্রোলের কাপড়ের দোকান থেকে এক টুকরো ছিট সুকৌশলে পেট-আঁচলে পূরে নিয়ে এসেছে। গোপেন যে কাবুলীওয়ালাটার

কাছে টাকা ধার করে—সেই কাবুলীওয়ালাটার কাছে ও আঙুর বেদানা, হিং আদায় করে! সুদ চাইতে এলে—নেবু বাইরে যায় —তাদের সঙ্গে কথা বলে। তাদের বলে—আজ নেহি। আজ নেহি। ভাগো আজ!

তারা নেবুর গাল টিপে আদর ক'রে দিয়ে সত্যিই ভেগে যায়।

গলির মোড়ে এক দল জোয়ান ছেলের আড্ডা বসে! শান্তি নিজের চোখে দেখেছে—ওদের সঙ্গে নেবুর হাসি-খুসী। ঢেলা মেরে ছুটে নেবুকে পালিয়ে আসতে দেখেছে। সে লক্ষ্য করে দেখেছে—ওই ছেলের দলের নজর নেবুর উপর আর চানাওয়ালার একটি মেয়ে আছে—সেটার উপর। চানাওয়ালার মেয়েটা নেবুর চেয়ে বয়সে বড়। সেটার বদনাম হতে আরম্ভ হয়েছে।

গোপেনের চাকরীতে দিন কাটে। সে এ সব কথা জানে না। জানে শুধু কাবুলীওয়ালাদের সঙ্গে প্রীতির কথাটুকু। সেটুকু সে সহ্য ক'রে নিয়েছে। সহ্য না করে উপায় নাই তাই নিয়েছে। এ নিয়ে গোপেন মেয়েকে কিছু বলে না কিন্তু অন্য একটা ছুঁতো নিয়ে সে মেয়েকে প্রহার করে। যে দিন কাবুলীওয়ালা এসে শুধু হাতে ফিরে যায়—সেদিন নেবুর অদৃষ্টে প্রহার নিশ্চিত। কথাটা নেবু ঠিক এখনও ধরতে পারে নাই কিন্তু শান্তি তো বুঝতে পারে সব! সে মুখ বুজে থাকে। নেবু লঙ্কা আনে বিনামূল্যে সেজন্যও শান্তি কিছু বলে না; মধ্যে মধ্যে মনটা কেমন করে উঠলেও এটা প্রায়ই তার সহ্য হয়ে এসেছে। কিন্তু নেবুর দেহের দিকে তাকিয়ে ওই ছেলেগুলোর সঙ্গে তার রীতি-আচরণ দেখে শান্তি শঙ্কিত হয়ে উঠেছে নেবুর সম্বন্ধে। নেবুকে এই সন্ধ্যার মুখে কোথাও যেতে দিতে তার ভরসা নাই।

নেবু পাশে বসল। মায়ের মুখ দেখে কথা বলতে সাহস হচ্ছিল না। তবু সে মধ্যে মধ্যে সাহস ক'রে দু-চারটে কৌতুকজনক সংবাদ না বলে পারলে না; কৌতুকও বটে—আবার হয় তো মাকে একটু হাসাবার জন্যও বটে। মায়ের মুখের ঐ গুমোট সে সহ্য করতে পারছিল না।

—যা' তা' কাণ্ড। যাচ্ছে-তাই। 'তুষি-নিন্দ্‌ষী' নাই, গুলী ছুড়ছে যার গায়ে লাগে লাগুক। ওই যে জগো কাঁদছে! গণেশ টকীর কাছে বাড়ী তাদের, মেয়েটি তেতলায় জানালাতে দাঁড়িয়ে দেখছিল—

—কেন দেখছিল? শান্তি চীৎকার করে উঠল—কেন দেখছিল?

নেবু স্তব্ধ হয়ে গেল ভয়ে। বুঝতে পারলে না—অন্যায় সে কি বললে!

শান্তি আবার চীৎকার করে উঠল—আর এরা যে লরী পোড়াচ্ছে, ঢেলা মারছে, লুঠ করছে! যারা পোড়াচ্ছে তাদের ধরে এনে ধরে দিক ওদের বন্দুকের সামনে। ওরা নিন্দ্‌ষীকে মারবে না গুলী।

উত্তেজিত হয়ে শান্তি উঠে দাঁড়াল।—তুই বস। আমি দেখছি।

শান্তি চলে গেল। নেবু বসে রইল চুপ করে! নেবুর মনে উদ্বেগ না-থাকা নয়, চারি দিকে গুলী চলছে, মানুষ মরছে, কত রকম খবর সে শুনেছে এরই মধ্যে—কত গুলী খেয়ে মরার কথা, কত ঢেলা মেরে পুলিশ মিলিটারীর মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার কথা, কত লরী পোড়ানোর কথা; চোখেও সে খানিকটা খানিকটা দেখেছে। শ্যামবাজারের মোড়ে গুলী চালানো সে দেখে নাই

কিন্তু গুলী খেয়ে যারা পড়েছিল তাদের সে দেখেছে। দেবা-ট্যাবার সন্ধানে বেরিয়ে ওদের সঙ্গীর কাছে গিয়ে তাদের কাছে শুনেছে কত কথা! ট্যাবার কথাই তারা বলেছে—বলেছে—"জান, নেবুদি, ট্যাবা একটা গলির মোড় থেকে যা ঢেলা একখানা হাঁক-ড়ালে। বাঁ—ই করে গিয়ে লাগল লরীতে। আমরা দে ছুট! দুম-দুম ক'রে গুলীর শব্দ হ'ল। আমরা ছুটে পালালাম। খানিকটা এসে দেখি ট্যাবা নাই। দেবা কাঁদতে লাগল। আমরা আবার ফিরলাম। দেখলাম ট্যাবা পড়ে গিয়েছিল সে উঠছে। আমরা ছুটে গেলাম। ট্যাবা হি-হি ক'রে হাসতে লাগল। বললে, পালাতে পারলুম না—পড়ে গেলাম। তো পড়েই থাকলাম। বুঝলি। ওরা ঠিক ভেবেছে আমার গুলী লেগেছে।" আরও বলেছে—ওরা শুনেছে—গুলী চালানোর সময় শুয়ে পড়লে আর ভাবনা নাই। "বুঝলে—সটান মাটির সঙ্গে সেঁটে উপুড় হয়ে পড়ে থাক—নড়ো না—বাস—মাথার উপর দিয়ে চলে যাবে গুলী—সাঁই-সাঁই। গায়ে লাগবে না। ওরা ভাববে মরে গেছে। চলে যাবে তখন উঠে পড়। বুঝলে নেবুদি, ট্যাবাটা আস্ত বিচ্ছু, ও শুয়েছিল কিন্তু হাতের ঢেলাটি ছাড়েনি। যেই না মোটরের শব্দ হয়েছে চলে যাওয়ার—বোঁ করে উঠে—সেটা হাঁকড়ে, একদম সড়াক—গলির মধ্যে।"

এ সব কথাগুলোর মধ্যে অফুরন্ত আনন্দ এবং উত্তেজনার আভাসই নেবু পেয়েছে, ভয় পায় নাই। তাই দেবা-ট্যাবার জন্য তার যে উদ্বেগ—সে উদ্বেগ খুব বেশী নয়। মায়ের মত নয়। নেবু দাওয়ার উপরে বসে পা দোলাতে আরম্ভ করলে। ভয় কিসের এত? দেবা-ট্যাবা মরবে না সে জানে। মরবে কেন? তা ছাড়া গুলী যদি লাগেও, তাই বা কি? গুলী লাগলেই কি মরে?

ওদের গুলী আছে—এদেরও ঢেলা আছে। বাঁ হাতে যা ঢেলা ছোঁড়ে ট্যাবা, লাগলে আর রক্ষা নাই। মাথায় লাগলে ফেটে ঘিলু বেরিয়ে যাবে। ঠিক ফিরে আসছে—দেবা-ট্যাবা।

ছোট ভাই দুটো খেলা করছে পথের উপর। হাবাটা উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দূরে। ছোটটা পথের ধূলোর উপরে বসেছে—একটা কচি আমড়া আর একটা দেশলাইয়ের খোল-ভর্ত্তি ছোলা-ভাজা নিয়ে। নেবুর বন্ধু ওই চানাওয়ালার মেয়ে লছমনিয়া দিয়েছে নিশ্চয়। বড্ড নোংরা এই ছোট ভাই দুটা। পথের ধূলোর উপর ছোলাগুলোকে ছড়িয়ে ফেলে তাই কুড়িয়ে খাচ্ছে। ঠিক ওইখানটাতেই— উঃ—গা বমি-বমি করে উঠল নেবুর। ওই বড় বাড়ীটাতে একটা অ্যালসেসিয়ান কুকুর আছে। সেটাকে নিয়ে ও-বাড়ীর ছেলেরা রোজ বিকেলে এইখানে খেলা দেয়। বল ছুড়ে দেয়, কুকুরটা ছুটে গিয়ে সেটাকে মুখে তুলে আনে। দু'দিন আগে সেই কুকুরটা ঠিক ওইখানটায় পায়খানা ফিরেছিল। হঠাৎ হেসে ফেললে নেবু। ঠিক তার মিনিট কয়েক পরেই এক জন হন-হন করে জুতো পায়ে দিয়ে চলে গেল পায়খানাটা মাড়িয়ে। খানিকটা চলে গেল বাবুটার জুতোর সঙ্গে—খানিকটা চেপটে বসে গেল ওইখানটায়। খা—খা, তাই খা মুখপোড়া—শয়তান—ওই ময়লাই খা। শয়তানকে সরিয়ে আনবার উপায় নাই। ওকে যদি এ সময় কেউ ছোঁবে তো একেবারে চিলের মত চীৎকার ক'রে শুয়ে পড়বে।

—আরে! পথের ধুলোতে ছোলাগুলো ফেলে তাই কুড়িয়ে খাচ্ছে। এই নেবু—তোল না এটাকে।

নেবুদের প্রতিবেশী কানু। এ পাড়ার এ অঞ্চলের বিখ্যাত কানু। বেশ সেজে-গুজে বেরিয়ে যাচ্ছে কানু। নেবু কানুর

কথার কোন জবাব না দিয়ে নির্ব্বিকার ভাবে উল্টে প্রশ্ন করলে—কি সেজে-গুজে বাবুর যাওয়া হচ্ছে কোথায় ? উঃ ! সাজ হয়েছে দেখি বাহারের ! সায়েব সেজেছেন বাবু।

হাফ-সার্ট, হাপ-প্যাণ্ট, পায়ে গোড়ালীতে ষ্ট্র্যাপ বাঁধা 'স্বামি-স্ত্রী' স্যাণ্ডেল (অর্থাৎ নারী পুরুষ উভয়েরই ব্যবহার্য্য) পরেছে কানু।

—মেলা ফ্যাচ-ফ্যাচ করিস নে। দেব এক ডাণ্ডা বসিয়ে মাথায়। কানু হাতের ডাণ্ডাটা দেখালে। লোহার ডাণ্ডা একটা।

অত্যন্ত চতুর মেয়ে নেবু। সে বুঝতে পেরেছে কানুর এই বেরিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য। সে ঘাড় নেড়ে বললে—হুঁ। অ কানুদাদার মা—। দেব বলে ? এর পর অত্যন্ত মৃদু স্বরে বললে—চললে বুঝি লরী পোড়াতে ? ঢেলা মারতে ?

কানু গম্ভীর মৃদু স্বরে বললে—চেঁচাসনি। মা শুনতে পাবে।

—আমাকে সঙ্গে নেবে ? আমি যাব ?

—তুই যাবি ?

—চল না সঙ্গে নিয়ে। তোমাদের চেয়ে আমি ভাল পারব

কানুর তাতে সন্দেহ নাই। নেবুর উপর বিশ্বাস তার অনেক ছেলের উপরে বিশ্বাসের চেয়ে অনেক বেশী। অত্যন্ত খুসী হয়ে উঠল সে নেবুর উপর। কানু মোটের উপর অসৎ নয়, তবে তার সততার সংজ্ঞার মধ্যে নেবুর সঙ্গে রহস্যালাপ করা গণ্ডীর বাইরে নয় ; ঢেলা ছোঁড়াছুঁড়িও নয় ; আজ সে তার গাল দু'টি টিপে দিয়ে বললে—আয়। চলে আয় তা' হলে।

—দাঁড়াও, কাপড়ের বদলে হাফ-প্যাণ্টটা পরে নি।

—আমি আসছি দাঁড়া। কানু হন হন ক'রে বাড়ীর দিকে ফিরল। ফিরে এল তার কাবলী জোড়াটা হাতে নিয়ে। নেবুদের দাওয়াটার উপর বসেই সে নিজে পরলে কাবলী জোড়াটা, নেবুর

জন্যে রাখলে ওই স্বামী-স্ত্রী স্যাণ্ডেলটা। নেবুর পায়ে ঠিক হবে। হিল্‌হিলে লম্বা নেবু সম্ভবত কানুর চেয়ে মাথায় আঙুল খানেক বড়। হাত-পা-ও বড় বড়। কানু মাথায় কিছু খাটো।

নেবু বেরিয়ে এল—হাফ-প্যাণ্ট হাফ-সার্ট পরে, মাথায় একখানা কাপড়ের পাগড়ী এঁটে; হাতের কাঁচের চুড়িগুলো পর্য্যন্ত খুলে ফেলেছে।

অবাক্ হয়ে গেল কানু।—ভারী চমৎকার মানিয়েছে রে তোকে।

—মানাবে না? নেবুর মুখখানা আশ্চর্য্য রকমের সুন্দর হয়ে উঠল এই মুহূর্ত্তটিতে।

কানু তার হাত ধরে বললে—বস।

নেবু বসতেই কানু তার পা টেনে নিয়ে জুতো পরাতে বসল। খিল-খিল করে হেসে উঠল নেবু।

ভাই দু'টো পথে খেলা করছে। নেবু একবার ভেবে নিলে। তার পর দু'টোকে দু'হাতে ধরে প্রায় ঝুলিয়ে নিয়ে ঘরের মধ্যে পুরে দিলে। কাগজের ঠোঙায় মুড়ি ছিল—মুড়ির ঠোঙাটা মেজের উপর ঢেলে দিয়ে বললে—খা।

কানু বললে—আহা, মাটিতে ঢেলে দিলি কেন? একটা কিছুতে—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে নেবু বললে—থামুন মশায়, আপনি কিছু জানেন না। হাসতে লাগল সে। আরও একটা কি খুঁজছে নেবু।

কানু বললে—মিইয়ে যাবে, ধুলো লাগবে—

—হ্যাঁ? কিছুতে ক'রে দিলে—রাক্ষসেরা এখুনি সব খেয়ে ফেলবে। মাটিতে ঢেলে দিলাম, তুলতে যাবে আর ছড়িয়ে পড়বে—কুড়িয়ে কুড়িয়ে খাবে।

দেশালাইয়ের বাক্সটা খুঁজে বার করে সে উঁচু তাকের উপর তুলে দিলে।

—আয়, আর দেরী করিস নে।

—যাচ্ছি। বঁটিটা তুলে দি! ওই ছোটটাকে বিশ্বাস নাই, ওটা সব পারে। রাগ হ'লে মেরে দেবে কোপ। ওটা বড় হলে খুব লড়াই করতে পারবে। তোমাদের চেয়ে অনেক ভাল।

ঘরের আলোটা জেলে দিয়ে নেবু বেরিয়ে এসে ঘরে শেকল দিয়ে বললে—থাক—কাঁদিস নে। আসছি আমি। চল।

লাফ দিয়ে সে নেমে পড়ল রাস্তায়।

—গলির মধ্যে দিয়ে চল কিন্তু।

লজ্জা পাচ্ছে নেবু। কানুর সঙ্গে এই বেশে সঙ্গে যেতে লজ্জা পাচ্ছে। আয়নাতে সে দেখে নিয়েছে মাথায় পাগড়ী পরে তাকে অবিকল শিখের বাচ্চাদের মত দেখাচ্ছে; বাসে সে শিখদের ছেলে দেখেছে। খুব ভাল ক'রে দেখেছে। সেই দেখার ফলেই সে নিজের খোঁপাটা খুলে চুলগুলো পিছন দিক থেকে টেনে এনে সামনের দিকে চূড়োর মত বেঁধে তবে তার ওপর পাগড়ীটা বেঁধেছে। হাতের চুড়িগুলো খুলতেও ভুল হয় নাই তার। চিনতে কেউ পারবে না—নিজেই নিজেকে চিনতে তার কষ্ট হয়েছে, তবু লজ্জা পাচ্ছে।

হাতখানা ধরলে তার কানু—আয়।

—ছাড়, হাত ছাড়। হাত ছাড়িয়ে নিলে নেবু।

সঙ্কীর্ণ গলিটা থেকে সঙ্কীর্ণতর একটা গলি বেরিয়েছে। দু' ধারে বস্তী। তার মধ্য দিয়ে এঁকে বেঁকে পথ। ডাইনে—বাঁয়ে —আবার বাঁয়ে—এবার সিধে, আবার বাঁয়ে! এবার সোজা

দেখা যাচ্ছে বড় রাস্তা। আলো জ্বলছে। আবার লজ্জা বোধ করছে নেবু।

—ধ্যেৎ—আমি যাব না।

কান্নু অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠল। একটু আগেই তার দলবল অপেক্ষা করছে। সে বললে—যাবি না তো আমার দেরী করে দিলি কেন? ভাগ। হাজার হলেও মেয়েছেলে তো! এ দিকে সিনেমার নামে—তখন ঠিক আছে। ভাগ—ভাগ—ভাগ।

কান্নু হন-হন করে এগিয়ে গেল।

এবার পিছন থেকে ছুটে এসে তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে নেবু এগিয়ে গেল—বললে—আয় না, আয় না রে! আয় না!

খিল খিল ক'রে সে হাসতে লাগল।

* * * *

নেশা লেগেছে নেবুর মনে। সে জন্মেছিল একখানা একতলা পাকা-ঘরে, তিন বছর বয়সে এসেছিল একটা টিনে ছাওয়া কোঠায়, পাঁচ বছর বয়স থেকে এই চৌদ্দ বছর পর্য্যন্ত সে বস্তীর খোলার ঘরে জীবনের আলো-বাতাস হাব-ভাব ধারা-ধরণ আয়ত্ত করেছে। তাদের বস্তীটা ভদ্র গৃহস্থের বস্তী। ওদের বস্তীর গায়ে চাকর ও ঝিয়েদের বস্তী। মজুরদের বস্তী। তার পর হ'ল দেহ-ব্যবসায়িনী-দের বস্তী। সেই বস্তীর মেয়ে নেবু। ওই তিনটে পল্লীর বাতাসের সঙ্গে ওদের ছোঁয়াচ অল্প সল্প আছে ওর মধ্যে। আরও একটা পল্লীর ছোঁয়াচও আছে। ওই পল্লী দু'টোর বাতাসে নিশ্বাস নিতে নেবু অস্বস্তি বোধ করে—যেন ড্যাপসা অসুস্থ গন্ধ অনুভব করে—কিন্তু বাধ্য হয়ে নিতে হয়। অন্য পল্লীটার বাতাসে সে ইচ্ছে করে নিশ্বাস নিয়ে আসে। তাদের বস্তীর দক্ষিণ দিকে বাগবাজার ষ্ট্রীটের কাছাকাছি পাকা দালানের বসতি। ছেলেরা কলেজে যায়,

মেয়েরা ঢাকাই শাড়ী—হিল-তোলা জুতো প'রে কপালে সিঁদুরের টোপা দিয়ে সিনেমায় যায় ; জানালা দিয়ে দেখা যায় ঘরের মধ্যে সোফা কৌচ—চেয়ার টেবিল। বাতাসে সেণ্ট—সাবান—গন্ধ-তেলের সুবাস। করপোরেশনের সমালোচনা, ইলেকসনের মিটিং, ও-পাড়ার ছেলেদের ব্যায়াম-সমিতির আখড়ায় তেরঙ্গা ঝাণ্ডা, সার্ব্বজনীন পুজো, মিটিং।

পিছনে ঝিয়েদের বস্তীতে—চাকর এবং ঝিয়ের ভালবাসা, ঝগড়া,. মারামারি। সামনে কলেজে-পড়া ছেলে—ইস্কুলে-পড়া—মেয়ে চিঠি দেয় এ-ওকে। ওই তো বড় বাড়ীটার মেয়েটা কলেজে যায়—মোড়ে ট্রামষ্টপে দাঁড়িয়ে থাকে ওর এক জন ছেলে-বন্ধু। একতলা দালান। বাড়ীটার দুই মেয়ের বড়জন চাকরী করে ; ষ্ট্র্যাপ-দেওয়া ব্যাগটার ষ্ট্র্যাপ বাঁ কাঁধে ঝুলিয়ে চোখে গগল্‌স্ প'রে মসলা খেতে খেতে চাকরী করতে যায়, ফিরবার সময় রোজ ওর একজন পেণ্টালুন আর সার্ট পরা বন্ধু তাকে বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে যায় ; ছোট বোনটা যায় ডাক্তারী পড়তে, ষ্টেথিসকোপ হাতে বই বগলে যায় আসে। ওরও বন্ধু আসে সঙ্গে। বড় রাস্তায় দাঁড়ালে—হরদম চোখে পড়বে ছেলে আর মেয়ে—মেয়ে আর ছেলে—হাসতে-হাসতে চলেছে, কথা বলতে-বলতে চলেছে। তাদের বস্তীতেও এই হাল-চাল ঢুকেছে। ওই যে তাদের বস্তীর শেষ বাড়ীটার মোটা-সোটা কাল মেয়েটি—সেও রোজ বার হয়, ওদের বাড়ীর দু'খানা এদিকের বাড়ীর কালো কাঠির মত মেয়ে অনিলা সেও যায় ; জুতো পায়ে দিয়ে—ফেরতা দিয়ে কাপড় প'রে ওরা যায় একটা সেলাই শেখার সমিতিতে। ওদেরও বন্ধু আছে। পথের মোড়ে আগে তারা দাঁড়িয়ে থাকত। এখন তো মোটা মেয়েটি—কি নাম ওর ?—বিজলী—বিজলী ওর নাম,—বিজলীর

বন্ধু তো এখন বাড়ী পর্য্যন্ত আসে। সে দিন নেবু ওদের দু'জনকে বাসে চেপে দক্ষিণেশ্বর যেতে দেখেছে। অনিলার বন্ধু এখন এই গলিটার মোড় পর্য্যন্ত আসে। তার মা-বাপের মধ্যে আলোচনা শুনেছে, সে যে, এই ভাবেই এখন বিয়ে হচ্ছে অধিকাংশ ছেলে-মেয়ের। বিশেষ করে যে সব মেয়ের বাপের পয়সা নাই—তাদের বিয়ের এই ছাড়া আর উপায় নাই। আরও আছে। এই তো সে-বার—আগষ্ট আন্দোলনে—এ পাড়ার বড়লোক, বড়লোকে ছেলে থেকে দোকানদার ওই যে মাখনের দোকান করে—সে পর্য্যন্ত জেলে গিয়েছিল, কমলাদি, নিরুদি, জয়ন্তীদি, সুনীতিদি এরাও জেলে গিয়েছিল। ওই যে বুড়ো ডাক্তার বাবুর মেয়ে ইলা, সে এখান থেকে পালিয়ে গিয়েছিল পুলিশে ধরবার আগেই। ওই এক জন বন্ধুর সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল বোম্বাই। সেইখানে তারা হাঙ্গামার মধ্যে ধরা পড়েছিল। এখন দু'জনে ছাড়া পেয়েছে, বোম্বাইয়েই আছে—দু'জনে বিয়ে করেছে—এই সব কাজই করে। যাও না সিনেমায়—সেখানে দেখবে—ছেলে আর মেয়ে হাত-ধরাধরি ক'রে চলা তো চলা—নাচছে। জানালার ধারে ঘরের মধ্যে মেয়ে—বাইরে রাস্তায় ছেলে দাঁড়িয়ে গান গাইছে—'চিঠি দিয়ো।' 'ভালো না লাগে তো দিয়ো না মন।' নেবুও গান গায়—ওই কান্নুর দলের সামনে দিয়ে আসবার সময় গুন-গুন করে গেয়ে চলে আসে।

আজ কলকাতার অবস্থা—শেকলে বাঁধা প্রহার-জর্জ্জরিত উন্মাদ পাগলের শেকল ছিঁড়ে ফেলবার চেষ্টায় দাঁড়িয়ে ওঠার মত অবস্থা। দাঁতে দাঁতে টিপে, বিস্ফারিত ঠোঁটের বিকৃতিতে বিকৃত মুখে দেহের সকল পেশী—সকল স্নায়ু টান করে সর্ব্ব শক্তি প্রয়োগে সে শিকল ছিঁড়তে চাইছে। মাথার বিশৃঙ্খল ধুলো-মাখা ঝাঁকড়া

চুল বাতাসে উড়ছে, রাঙা টকটকে চোখ দু'টো বড় বড় হয়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে চক্ষুকোটর হতে। তারই নেশা লেগেছে নেবুর মনে।

উনিশ শো ছেচল্লিশ সালের কলকাতার মেয়ে নেবু। কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনের প্রান্তসীমায় পা দিয়েছে। পৃথিবীর সকল আওতা থেকে মুক্ত হয়ে নিজের মনের খুসীতে চলবার আকাঙ্ক্ষা জেগেছে পাখা-গজানো পাখীর ছানার মত। কানু বা কানুর দলের কোন এক জনকে বন্ধু হিসেবে নিয়ে সে অন্য সকলের মত চলতে চায়। কিছু দিন থেকেই এ সাধ উকি-ঝুঁকি মারছে তার মনে।

উনিশ শো ছেচল্লিশ সালের কলকাতার মেয়ে নেবু। আগষ্ট আন্দোলন সে দেখেছে, সে জানে আগষ্ট আন্দোলন। 'ভারত ছাড়ো' জানে সে—"করেঙ্গে ইয়া মারেঙ্গে" তাও জানে সে; যুগান্তরের দরজায় তার ছবি সে দেখেছে। সে মহাত্মা গান্ধীকে জানে—মৌলানা আজাদ—পণ্ডিতজীকে জানে। আজাদ হিন্দ ফৌজ—নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে জানে। ক্যাপ্টেন লক্ষ্মীর নাম জানে। 'কদম কদম বাড়ায়ে যা' গানটা সে মুখস্থ করে ফেলেছে—সুর শিখেছে। বিশ্ব-যুদ্ধের আতঙ্ক—কষ্ট—দুর্ভোগ সে ভোগ করেছে। সাইরেণ—কণ্ট্রোল—ব্ল্যাক আউট—লরীর তলায় মানুষের অপঘাত—পথের উপর না খেয়ে মানুষের মৃত্যু—সমস্ত কিছুর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া তার মনের ধাতুকে দু'পিঠে হাতুড়ির মত ঘা মেরে মেরে এমন বেদনার্ত স্পর্শাতুর করে রেখেছে যে, এতটুকু উত্তেজনার ছোঁয়ায়—চরমতম অধীরতায় চঞ্চল হয়ে ওঠে; মা-বাপের অনুপস্থিতির সুযোগে সে আজ যা করলে, ঠিক তাই ছাড়া আর কিছু করতে পারত না। এ নেশা লাগা অনিবার্য্য নেবুর পক্ষে।

শীতের শেষ—বসন্তের প্রারম্ভ—ঝোড়ো হাওয়া ওঠে—পাকা পাতা ঝরে স্বাভাবিক নিয়মে। ঝোড়ো হাওয়ার বদলে এসেছে অকালের ঝড়। পাতা ঝ'রে উড়ে নেচে-নেচে চলেছে আকাশে।

আঃ—কমলাদি, নিরুদি, জয়ন্তীদি, সুনীতিদিদের সঙ্গে একবার দেখা হয় না। নেবু চলছে আগে আগে। ছেলের দল তার পিছনে। তাদের বুকে রক্ত দোলা দিচ্ছে—প্রবলতর আন্দোলনে আজকের নেশাকে দ্বিগুণিত করে তুলেছে নেবু।

* * * *

বোসপাড়ার ভেতর দিয়ে সেণ্ট্রাল এ্যাভিন্যু। অন্ধকারে গলির মুখে মানুষের জটলা শুধু। আর কিছু নাই। একটা পানের দোকানের সামনে জটলাটা বেশী। ঝুঁকে গিয়ে পড়ল নেবু। জটলার মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে এক জন কটাসে রংয়ের লোক আস্ফালন করছে।

—ঢেলার সঙ্গে গুলীর লড়াই। ফুঃ—ফুঃ—ফুঃ! মাটির উপর থুথু ফেললে সে। এর পর হঠাৎ চোখ দু'টো তার জ্বলে উঠল; বেড়ালের চোখের মত কটা চোখ, সে চোখ জ্ব'লে উঠায় অদ্ভুত একটা ছটা বেরিয়ে আসে,—অত্যন্ত ভয় লাগে দেখে; শুধু তাই নয়,—ছোঁয়াচ লাগে সকল মানুষের চোখে! সে বলে উঠল —"মরদের বাচ্চা হয়, সাহস থাকে তো দাও বাবা আমাদের হাতে রাইফেল রিভলভার, তার পর হোক সামনা-সামনি লড়াই। ধর্ম্মযুদ্ধ হোক।"

হঠাৎ সে হা-হা ক'রে হেসে উঠল, বললে—"খালি হাতে যারা লড়াই করছে, তাদের হারাবার জন্যে ট্যাঙ্ক এনেছে—শ্যামবাজারের মোড়ে প্রকাণ্ড একটা ট্যাঙ্ক।" হা-হা করে সে হাসতেই লাগল।

—কি নাম মশাই আপনার? জটলার পিছন দিক্ থেকে এক জন প্রশ্ন করলে গম্ভীর ভাবে।

—নাম? ঘুরে তাকালে সে!

জটলাটা থম-থম করতে লাগল। হাসি বন্ধ হয়ে গেল, চোখের দৃষ্টিতে ফুটে উঠল চকিত আতঙ্ক—তার পর ঘৃণা—তার পর ঔদ্ধত্য।

প্রশ্নকারী বললে—হ্যাঁ, নামটা বলুন না আপনার?

এগিয়ে গেল বক্তা। জটলার মধ্য থেকে কয়েক জন সরে গেল। কয়েক জন চোখে চোখে ইসারা করে লোকটার পিছনের দিকে যাবার আয়োজন করলে।

—এনিন নাম!

—বলুন। বলে লোকটা হা-হা করে হেসে উঠল।

কটা লোকটাও হা-হা করে হেসে উঠল। ওরে শালা!

রসিকতা। লোকটা গোয়েন্দাগিরির অভিনয় করছিল রসিকতার কৌতুকে।

—কি খবর?

লোকটি বললে—খবর জগুবাজারে, হাজরায়, মাণিকতলায়, রাজা বাজারে খবর কাঁকনাড়ায়, গুলী চলছে, ষ্টেশন পুড়িয়ে দিয়েছে। ট্রেণ পুড়িয়ে দিয়েছে। বিলকুল ট্রেণ বন্ধ। লাইনের উপর লোক শুয়ে আছে—গাছ কেটে ফেলেছে। হা হা হাসতে লাগল সে।

সতর্ক হয়ে উঠল নেবু। তার সামনের লোকটা পিছন ফিরে তাকে দেখতে চেষ্টা করছে। বুঝতে পেরেছে নেবু তার বিস্ময়ের কারণ। ভিড়ের চাপে—তার বুকের স্পর্শ লেগেছে লোকটার পিঠে। মুহূর্ত্তে নেবু ভিড় থেকে গুঁড়ি মেরে মাথা দিয়ে ভিড়

ঠেলে বেরিয়ে পড়ল। কানুর জামাটা ধরে টান দিলে। সামনে ফাঁকের মাথায় একটা পার্ক, এ পাশে পেট্রোল পাম্প; পার্কের ভিতরটা অপেক্ষাকৃত অন্ধকার—সেই অন্ধকারের আশ্রয় নিলে নেবু। পার্ক পেরিয়ে—সেণ্ট্রাল এ্যাভিন্যু পার হয়ে গলিপথ। ঢুকে পড়ল গলিটায়।

মাণিকতলা জানে নেবু। বায়স্কোপ আছে একটা। সেখানে ছবি দেখে এসেছে।

দলটা এর মধ্যে ভেঙে গিয়েছে। তিন জন নাই। কোথায় খসে পড়েছে। পড়ুক। কানু আছে সঙ্গে। মাণিকতলার মোড়ে এসে নেবু-কানুর দল উৎফুল্ল হয়ে উঠল। জনতা জমে আছে। রাস্তায় ব্যারিকেড। তাদের বয়সী ছেলে অনেক। তারাই যেন সংখ্যায় বেশী। লুঙ্গি পাজামা—পাজামা লুঙ্গি। নেবু বললে—সব মুসলমান!

—হ্যাঁ।

এক জন ঘুরে তাকালে নেবুর দিকে। বললে—কাঁসে হিন্দু-মুসলমান এক হো গিয়া পাঁইজী। লালবাজারমে এক হো গিয়া। হিন্দু-মুসলিম—জিন্দাবাদ!

জোরালো শব্দে সিটি বেজে উঠল উত্তর দিক্ থেকে। চঞ্চল হয়ে উঠল জনতা। গলির মুখে ভাঙাচোরা লোহার আড়তগুলোর মধ্যে লুকিয়ে গেল সব। যে লোকটি নেবুকে কথা বলেছিল—সে বললে—আ যাও পাঁইজী। আতা হ্যায় উ লোক।

জোরালো আলো তীব্রগতিতে এগিয়ে আসছে। লরী আসছে। নেবু ব্যস্ত হল ঢেলা সংগ্রহের জন্য।

—চলে আও। চলে আও। আ গেয়া—আ গেয়া! একটা গলির মুখ। রাস্তার গ্যাস-লাইটটা নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। অন্ধকার থমথমে হয়ে উঠেছে সঙ্কীর্ণতার আশ্রয়ে।

—বইঠ যাও—বইঠ যাও। আরে বসে পড় না।

লরী এসে থামল। থামল ঠিক নেবু-কানুরা যে গলিটায় আশ্রয় নিয়েছিল—তারই সামনে। ঢেলা হাতে নেবু উঠে দাঁড়াচ্ছিল, এক জন হাত চেপে ধরলে।—হুঁ। ওদিকে লরীটার পিছন দিক্ হতে ঝাঁকে ঝাঁকে ঢেলা এসে পড়ছে। আ—। দু'জন মাথায় হাত দিয়েছে। পিছন দিকে ফিরল ওরা—বন্দুকের মুখ ঘুরল। জন দুয়েক লাফিয়ে পড়ে ব্যারিকেড সরাতে লাগল। পিছনের দিকে টর্চ ফেলে খুঁজছে, ঝাঁটার মত ক্রম-প্রসারিত আলোর সীমানার বাইরে—আলো-আঁধারির মধ্যে ছায়া-মূর্ত্তির মত দ্রুত সরে যাচ্ছে—বাচ্চার দল বেশী। বন্দুক উদ্যত করেছে ওরা। সঙ্গে সঙ্গে সামনের দিক্ থেকে এল ঢেলার ঝাঁক।

বন্দুকের শব্দ হল।

—লাগাও—আব লাগাও।

উঠে পড়ল নেবু। ছুড়লে ঢেলা। একটা দু'টো তিনটে।

ওদিকে ব্যারিকেড সরে গেছে। একটা লোক ঢেলা খেয়ে জখম হয়েছে। তাকে টেনে তুলে নিলে লরীর উপর। লরী পূর্ণবেগে ছুটল। পিছনে ছুটে বার হল মানুষের দল—বুনো কুকুরের দলের মত। বাঘের সঙ্গে লড়াই দেয় বুনো কুকুরের দল। তাকে চার পাশে আক্রমণ করতে করতে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলে; চীৎকার করে আক্রোশে, পিছন থেকে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে আঁচড়ায় কামড়ায়। আক্রান্ত ক্রুদ্ধ শক্তিমত্ত বাঘ গর্জ্জন করে—মধ্যে মধ্যে হাকড়ায় তার থাবা—ডাইনে বায়ে—যেটাকে লাগে সে থাবা—সেটা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে লুটিয়ে পড়ে, কখন বিদ্যুৎগতিতে পিছন ফিরে অগ্রগামীটার উপর লাফিয়ে প'ড়ে টুকরো টুকরো ক'রে দেয়; কিন্তু তবু সে থামতে পারে না—ছুটতে হয় তাকে; সমষ্টির শক্তির পরিচয় সে

জানে ;—সে ছুটে চলে। পাগল বুনো কুকুরের দল আহতদের পিছনে ফেলে বাঘের সঙ্গে সঙ্গে ছোটে। আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঘের উপর।

এও প্রায় তাই। উন্মত্ত ক্ষোভে মানুষ হয়ে উঠেছে যেন বুনো কুকুরের দল। তাদের বনে এসেছে বাঘ ; আহারের অভাব ঘটে গেছে তাদের, ভয়ে সঙ্কোচে অন্ধকারে আত্মগোপন ক'রে ক'রে অধীর হয়ে উঠেছে তারা, তার উপর প্রকৃতি হয়েছে নির্মম—শীতার্ত্ত বনভূমি ; সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে তাদের—তারা বেরিয়ে পড়েছে। ছুটছে—সাক্ষাৎ মৃত্যুর বসতি যে থাবায়—দাঁতে—সেই থাবার পাশে পাশে ছুটছে।

গুলী ছুটে এল এক ঝাঁক, ধাবমান লরী থেকে। থমকে দাঁড়িয়ে গেল লোকেরা। লরী দূরে চলে গেছে, পিছনে দেখা যাচ্ছে—লাল দু'টো আলো।

এবার রাস্তার উপর ছোট-ছোট জনতা। এখানে ওখানে সেখানে। আহত হয়েছে যারা—তারা পড়েছে। তাদেরই ঘিরে দাঁড়িয়েছে সব। আরও একখানা লরী আসছে পিছনে। এ্যাম্বুল্যান্স আসছে—ডাক্তারদের গাড়ী—মিটিয়া কলেজে নিয়ে যাবে। তার আগেই ওরা তুলে নিয়ে যাচ্ছে বস্তীর মধ্যে। মিটিয়া কলেজ সম্বন্ধে ওদের অনেক আতঙ্ক, সেখানে ছুরি চালায়, মরা লাশ ফালি ফালি ক'রে চিরে ফেলে। তার পর তদন্ত। সে তদন্তে এই বস্তীতে ওর বাড়ী জানাজানির সঙ্গে সঙ্গে বস্তী ঘিরে লাল-পাগড়ী। খানাতল্লাস!

উঠাও। উঠাও জলদি!

কানু কই? কানু! কানু! বিমল! হেমন্ত! নরেন! কই?

রাস্তার আলো কুয়াসায় ঢেকে যাচ্ছে, কুয়াসাটা কালো হয়ে আসছে। নেবু টলছে। সুখের তারা দুঃখের মেঘে ভরা গ্রীষ্মের আকাশের মত নেবুর মন—কালো কুয়াসায় হারিয়ে গেল; কলকাতার আলো—হাঙ্গামায় জমায়েৎ এত মানুষ—সব ঢেকে মিলিয়ে গেল। কিছুই মনে হচ্ছে না, কাউকে মনে পড়ছে না; শুধু একটা তীব্র যন্ত্রণা। তাও মিলিয়ে যাচ্ছে। নেবু পড়ে গেল রাস্তার উপর।

*　　*　　*　　*

—নেবু! নেবু! নেবু! ওরে—নেবু!

—নেবু খাঁলিয়া। কামলা নেবু! হা-হা ক'রে হেসে উঠল কতকগুলি লোক। আহতদের রেখে আবার তারা ফিরে এসেছে। অবশ্য এখন তারা সংখ্যায় অনেক কম। কানু নেবুকে খুঁজছে। বিমল—হেমন্ত—নরেন এরা সব কোথায় কে গেল? সব ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছে। তাদের জন্য কানু ভাবছে না। সে খুঁজছে—নেবুকে। গলির মোড়ে মোড়ে জনতার মধ্যে সে খুঁজছিল মাথায় পাগড়ি। গলির মধ্যে সে ঢুকে পড়ল।

—এ ভাই, এক জন—মাথায় পাগড়ী—শিখের ছেলে দেখেছ?

—হ্যা। এক জন তো দেখেছিলাম। সে তো—গুলীর আগে। পরে তো দেখি না।

—নেবু!

কোথায় নেবু? বস্তীর মধ্যে আহতদের কাতরাণি, চাপা কান্না, ক্রুদ্ধ উন্মত্ত কণ্ঠের চাপা শাসন। ঘুরতে ঘুরতে বেরিয়ে এসে বড় রাস্তায় পড়ল কানু! স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল!

—নেবু!

দূরে একটা জনতা জমেছে। রেডিয়োতে খবর বলছে। কথাগুলো কানে অস্পষ্ট ভাবে বাজছে। ওখানে নেই তো। এগিয়ে গেল কানু !

"বাঙলা গভর্ণমেণ্ট কলকাতার অধিবাসীদের সাবধান করে এক ইস্তাহার জারী করেছেন। তার মর্ম্ম হচ্ছে যে, যে কেউ রাস্তা অবরোধ করবে বা রাস্তায় চলাচল বা ব্যবহারে বাধা জন্মাবে, পুলিশ বা সামরিক বাহিনী তাদের গুলী করতে পারবে। শহরে ১৪৪ ধারা জারী করা হয়েছে। স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে না আসা পর্য্যন্ত জনসভা বা শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করেছেন।"

গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে দৃঢ় ভাবে বলা হয়েছে এই ইস্তাহারে যে, প্রত্যেক শান্তিকামী নাগরিকের জীবন রক্ষা করতে হবে এবং বিনা বাধায় স্বাধীন ভাবে যাতে তাঁরা আইনসম্মত কাজকর্ম্ম করতে পারেন—তার ব্যবস্থা গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য—সে কর্ত্তব্য তাঁরা অবশ্যই পালন করবেন।"

—আল্লা হায় ! আল্লা হায় !

আবার মোটরের আলো এসে পড়েছে—আসছে। ব্যারিকেড ঠিক করো।

গাড়ীটার উপরে জোর আলো জ্বলছে। মাথার উপরে পাশাপাশি বাঁধা দু'টো ঝাণ্ডা। তেরঙ্গা আর সবুজ। কংগ্রেস-লীগ ঝাণ্ডা। গাড়ীখানা এসে দাঁড়াল।

"নেতৃবৃন্দের বিশেষ অনুরোধ, কংগ্রেস এবং লীগ—দুই প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দের অনুরোধ—এই ধরণের উন্মত্ততায় আপনারা অকারণ শক্তিক্ষয় করবেন না। বৃহত্তর সংগ্রাম আমাদের সম্মুখে—।"

কানু আর দাঁড়াল না। নেরু ! কোথায় গেল নেরু ? নেরু ! নেরু !

হঠাৎ মনে হ'ল এ্যাম্বুল্যান্সখানা এখান থেকে উত্তর মুখে ফিরে গিয়েছে। কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ !

শেষ রাত্রির কলকাতা। তিনটে বাজছে। কানুর ক্লান্ত পায়ের কাবলীর আওয়াজ উঠছে পিচের রাস্তার উপর। শীতের রাত্রেও ঘেমে উঠেছে কানু ; বুকের ভিতর অসহনীয় উদ্বেগ—চোখ জ্বলছে—কেঁদেছে সে প্রচুর কেঁদেছে—নেবুর জন্য। কারমাইকেল —মেডিকেল কলেজ—ক্যাম্পবেল—সমস্ত জায়গা ঘুরেছে সে। সঠিক খবর পায়নি—আহতদের দেখতে পায়নি রাত্রে—কিন্তু তার মধ্যে কিশোরী কুমারী কেউ নাই। মৃতদের দেখেছে সে। দেখে ভয় হয়নি তার। কিন্তু উদ্বেগ আক্ষেপ বেড়েছে। নেবু কোথায় গেল তবে ? মহানগরীর রাজপথের শেষ রাত্রের জনহীন রূপ— সে রূপ ভয়ঙ্কর। যে প্রাণ-সমুদ্র এই বিরাট্ ইট-কাঠ-পাথরের প্রাণহীন কঠিন রূপকে ঢেকে রাখে—সে প্রাণ-সমুদ্র রাত্রের অন্ধকারে সুপ্তির মধ্যে অদৃশ্য। জড় রাজত্ব আপনাকে প্রকট করে তুলেছে এখন। মরা পাহাড়ের বুকে একক যাত্রীর মত চলতে চলতে কানু কেঁদেছে। অজস্র কেঁদেছে।

নেবু ! নেবু !

থমকে দাঁড়াল কানু।

নেবুদের বাড়ীর দাওয়ায় বসে শান্তি, আর গোপেন।

—কে ?

—আমি।

—কে ? আমিটা কে ?

—আমি কানু !

—কানু ? নেবু—

—এ্যা ও—। হঠাৎ গৰ্জ্জন করে উঠল গোপেন। শান্তি স্তব্ধ হয়ে গেল।

কানু এবার সাহস ক'রে ঢুকল গলির মধ্যে। থমকে একবার দাঁড়াল—ঘরে আলো জ্বলছে। দেবা—ট্যাবা—হাবা—সবু—চার জনে শুয়ে রয়েছে। নেবু নাই। এতক্ষণে চোখে পড়ল—গোপেনের পায়ে ব্যাণ্ডেজ! কিন্তু প্রশ্ন করবার মত কণ্ঠস্বর বা'র হচ্ছে না। কান্নার ঢেউ এসে আছড়ে পড়বে। নেবু! নেবু!

উঃ! ঝাঁকি দিয়ে মাথাটায় নাড়া দিয়ে—কানু দ্রুত চলে গেল নিজেদের বাড়ীর দিকে। দরজায় হাত দিয়ে দাঁড়াল। ডাকবার মত কণ্ঠস্বরও তার নাই। নেবুর জন্য কান্নায় তার সকল স্বর ভরে আছে। সে এক মুহূর্ত্ত ভেবে নিয়ে, দরজার গোড়াতেই এক টুকরো বাঁধানো রোয়াক,—তারই উপর শুয়ে পড়ল।

নেবুর মা শাস্তি নেবুকে গড়ে ধরার জন্য 'প্রথমটা কপালে চড় মেরেছে। চড়ের পর চড়। শুধু একা নেবুকে গড়ে ধরার জন্যই নয়—সকল সন্তানগুলোকে গড়ে [illegible] জন্য প্রচণ্ডতম' আক্ষেপে কপালে করাঘাত করেছে, নিজের গর্ভের উপর আঘাত করেছে, সবগুলোর মৃত্যু কামনা করেছে, স্বামীর মৃত্যু কামনা করেছে। কয়েকবার গলির মোড় পর্য্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিল, ইচ্ছে হয়েছিল ছুটে গঙ্গার তীরে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়বে এক মুহূর্তে। কিন্তু ফিরেছে। নেবু দেবু টেবু আর তার স্বামীর সংবাদ না পেয়ে মরতে যেতে পারে নাই। মরে শান্তি পাবে না সে।

একটা দুটো তিনটে চারটে লাশ একে একে আসুক—সবগুলোর মুখে আগুন দিয়ে—তার পর সকলের আগে আসুক নেবুটার লাশ। সে লজ্জার হাত থেকে রেহাই পাক। তের-চৌদ্দ বছরের মেয়ে—দেহে 'মেয়ে-লক্ষণ' ফুটতে আরম্ভ করেছে—সে এই দুর্য্যোগের কলকাতার—এই মন্বন্তরের কলকাতার—এই রাক্ষুসে কলকাতার পথে বেরিয়েছে সন্ধ্যের পর রাত্রিকালে। [illegible]ন অরণ্যে আর রাত্রের কলকাতায় কোন তফাৎ নাই। তাদের পিছনে ওই ঝিয়েদের বস্তী, তারও পিছনে বেশ্যাদের বস্তীর সরু গলিপথে যে সব মানুষ চলে-ফেরে—তাদের চোখের চাউনি আর জানোয়ারের চোখের চাউনির মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। বড় রাস্তায় পুলিশ বেরিয়েছে—পল্টন বেরিয়েছে—লালমুখো গোরার দল—আফ্রিকার দলবদ্ধ সিংহের মত। হারামজাদী নেবুই একখানা বই এনেছিল

ও-বাড়ীর কানুর কাছ থেকে—'বনে জঙ্গলে' নাম বইখানার, তাতেই শান্তি পড়েছে সিংহ বের হয় দল বেঁধে। সে নিজে দেখতে গিয়েছিল দেবা আর ট্যাবাকে অনেক দূর পর্য্যন্ত। বাগবাজারের মোড় থেকে নিউ-শ্যামবাজার ষ্ট্রীট ধরে সেন্ট্রাল এ্যাভিন্যুর খানিকটা দূর অবধি সে গিয়েছিল। কোথায় দেবা—কোথায় ট্যাবা? তবে অন্য লোকের অনেক দেবা ট্যাবাকে দেখে এসেছে। খুদে শয়তানের দলের কোন দিকে দৃক্‌পাত নাই, মরণ-বাঁচন জ্ঞানগম্যি নাই, কারও কথায় কর্ণপাত করে না—এই নিয়েই মত্ত। জয় হিন্দ্! নেতাজী সুভাষচন্দ্র কী জয়! বন্দে মাতরম্! ইনকিলাব জিন্দাবাদ! ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক! চেঁচাচ্ছে, চেঁচাচ্ছে! বার দুই-তিন শান্তি তাদের জিজ্ঞাসা করেছিল—দুটি ছেলেকে জান? নাম দেবা আর ট্যাবা। বাগবাজার বাড়ী। ছোট ছেলেটা ট্যাবা বাঁ হাতে ঢেলা ছোঁড়ে। কথার উত্তর না দিয়ে তারা চেঁচিয়ে উঠেছিল—আসছে! আসছে! এই—এই—এই! এই মেয়েলোক! কে গো তুমি—হটো—ভাগো—মিলিটারী আসছে।

মুহূর্ত্তের মধ্যে দৈত্য-দানার বাচ্ছার মত সব অদৃশ্য হয়ে গেল যেন। জাল দিয়ে মোড়া লরী চলে গেল; গলির মুখটা পার হবার সময় ঢেলার যেন শিলাবৃষ্টি হয়ে গেল। লরীর উপর থেকে এল বন্দুকের গুলী। শান্তি ভয়ে বসে পড়েছিল। শান্তির কপাল, একটা গুলী তাকে লাগল না। আর তার যেতে সাহস হ'ল না। ফিরল সে। নেবু এবং ছোট দুটোর জন্যও ভাবনা হচ্ছিল। সে ভাবনা তার অহেতুক নয়। ফিরে দেখল—ছোট ছেলে দুটো ঘরের মধ্যে চীৎকার করছে, নেবু নাই। বুকটা তার ছ্যাৎ করে উঠল। নেবুকে সে জানে। ছ মাস আগে গোপেনের অসুখ করেছিল—

কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ছিল, নেবু রাত্রে গিয়ে দারোয়ানদের কাছে থেকে খবর নিয়ে এসেছে একা। এ বছরের বর্ষায় বাগবাজারের ঘাট থেকে রাত্রি ন'টায় খদ্দেরের ভিড় কমে গেলে সস্তায় গঙ্গার ইলিশ কিনে এনেছে। এক একদিন সস্তা মাছের খোঁজে গঙ্গার ধারের ওই অন্ধকার পথে আহিরী... ঘাট পর্য্যন্ত গিয়েছে সেই নেবু। ঘরের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখে তার আর সন্দেহ রইল না। রান্নার হাঁড়ি-কড়াইগুলি উপরে তুলে রাখা হয়েছে, বঁটিটাও তুলে রেখেছে, যে জিনিষগুলি ভাঙতে পারে—তাও সযত্নে সামলে রেখেছে। তার পর আর তার সন্দেহ রইল না। সে ডাকিনী এই খেপে-ওঠা কলকাতার রাস্তায় এই রাত্রিকালে বেরিয়েছে দেবা আর ট্যাবার সন্ধানে। সন্ধানেও বটে—আবার এই হানাহানি খুনোখুনি দেখবার নেশাতেও বটে! শান্তি বেরিয়ে এসে—পথের উপর কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে রইল, তার পর বসে পড়ল ওই দাওয়ার উপর।

রাত্রি দশটায় ফিরল—দেবা আর ট্যাবা। দুজনের কাঁধে দুটো পুঁটলী। এই দুরন্ত শীতের দিনে খালি গা, গায়ের জামা খুলে তাই দিয়ে পুটলী বেঁধে কি নিয়ে এসেছে। ছেলে দুটো এসে মাকে দাওয়ায় বসে থাকতে দেখে থমকে দাঁড়াল। শয়তান, প্রেত, অপগণ্ড হতভাগাদের ভয় হয়েছে এবার। ফিস্-ফিস্ ক'রে দুজনে কি বলা-বলি করছে। শান্তির মনে দুর্দ্দান্ত রাগ—ক্ষোভ জ্বলন্ত-প্রায় কয়লার উনোনের উত্তপ্ত ধোঁয়ার মত কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে। ইচ্ছে হচ্ছে —ওদের দুটোকে মাটিতে ফেলে দুজনের গলায় দুটো পা দিয়ে নূতন সন্তানঘাতিনী একাদশ মহাবিদ্যার রূপ প্রকট করে। তারপর বের হয় নাচতে নাচতে। সৃষ্টি ধ্বংস করে ফেলতে। নখ দিয়ে চিরে, দাঁত দিয়ে টুঁটী ছিঁড়ে ফেলে সমস্ত সৃষ্টিটাকে টুক্‌রো টুক্‌রো

করে দিতে। মধ্যপথে গুলী এসে লাগে তার বুকে—বাস, সব যন্ত্রণার অবসান হয়ে যায়। সে উঠল।

—আয়—আয়—এদিকে আয়। শোন।

পিছিয়ে গেল ছেলে দুটো। ওরা বুঝতে পেরেছে—শান্তির বুকের আগুনের আঁচ পেয়েছে। চোখ দিয়ে আগুনের শিখা বোধ হয় উঁকি মারছে। এগিয়ে গেল শান্তি, দেবা ট্যাবা ছুটে পালিয়ে গেল খানিকটা। গাঢ় অন্ধকার একটা গলির মোড়ে গিয়ে দাঁড়াল। শান্তি আরও এগিয়ে এলে তারা ওই গলির মধ্যে ঢুকবে। ঝিয়েদের বস্তীর গলি। বড় হয়ে তো ওইখানে ওরা ঢুকবে, ঠেলা মেরে শান্তি গোপেনকে যে ভদ্রপল্লীর পাকা-বাড়ী থেকে ভাগের পাকাবাড়ী, সেখান থেকে টিনের কোটা-বাড়ী, সেখান থেকে ঝিয়েদের বস্তীর সামনের এই বস্তীতে এনে ঢুকিয়েছে—সেই ওই দেবা ট্যাবা হাবা সবাকে ওই ঝিয়ের বস্তীতে ঠেলবে—তারা ওই ঝিয়েদের সঙ্গে সংসার পাতবে। তার পর ওখান থেকে পিছু হটে যাবে ওই পিছনের বস্তীতে—বেশ্যাপল্লীতে, গলিতে দাঁড়িয়ে থাকবে ছুরী হাতে অথবা ব্লেড কি কাঁইচি হাতে। রাহাজানি কি খুন কি পকেটমার হবে। নেবুও যাবে বোধ হয় ওইখানে। তা ছাড়া আর কোথায় নেবুর গতি? আজ এই মুহূর্তে শান্তির চোখে কোন রঙ নাই, অন্ধকারের মধ্যে সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ভবিষ্যৎ। সাধারণ সময়ে সে নেবুর বিষয়ে কল্পনা করে। পাড়ার ছেলেদের কেউ নেবুকে ভালবেসে বিয়ে করবে। ওই বড় বড় বাড়ীর ছেলেদের কেউ নেবুকে ভালবেসে ফেলবে না—কে বলতে পারে? অসম্ভব কিসে? এই তো সিনেমায় সে দেখেছে—বস্তীর মেয়ের সঙ্গে লক্ষপতির ছেলের বিয়ে হচ্ছে। লক্ষপতির মেয়ে বস্তীর বাউণ্ডেলেকে বিয়ে করছে। আবার কল্পনা করে—নেবু গান শিখছে—কোন মতে রেডিয়োতে

গান গাইবার সুযোগ পাবে নেবু, তার মিষ্টি গলার গান শুনে কেউ হয়তো নেবুকে চিঠি লিখে বিয়ে করে ফেলবে। আবারও কল্পনা করে, নেবু সাহসী মেয়ে—দেখতেও তার শ্রী আছে—চটক আছে—পথে-ঘাটে ঘুরতে-ফিরতে গিয়ে কোন ছেলের সঙ্গে আলাপ হবে, বাড়ীতে আসবে-যাবে—তার পর বিয়ে হবে। আজ তার সে সব কোন কল্পনার ঘোর নাই। সে স্পষ্ট দেখছে নেবুর ভবিষ্যৎ। নেবুর বয়স বাড়বে, বিয়ে হবে না, অকস্মাৎ একদিন প্রকাশ পাবে নেবুর সর্ব্বাঙ্গে মাতৃত্বের আভাস। নয় তো হঠাৎ একদিন দেখা যাবে—নেবু নিরুদ্দেশ। তার পর নেবুকে একদা দেখা যাবে ওই পল্লীতে। সময়ে সময়ে শান্তি কল্পনা করে নেবু সিনেমায় যাবে। কত ভদ্রঘরের মেয়ে সিনেমায় নামছে; উপার্জ্জন করছে; দেওয়ালে-দেওয়ালে তাদের ছবি, হাজার হাজার টাকা উপার্জ্জন, বাড়ী-গাড়ী, গহনা-শাড়ী, কিছুরই অভাব নাই তাদের; লোকের মুখে-মুখে তাদের নাম। অমনি হবে নেবু। আজ মনে হল সিনেমাতেও যদিই স্থান পায় নেবু, তবে সে স্থান পাবে সিনেমায় যারা ঝি সাজে, বস্তীর মেয়ে সাজে—তাদের মধ্যে; ওই যে কদর্য্য পল্লীটা, ওর সামনে মধ্যে মধ্যে সিনেমার গাড়ী এসে দাঁড়ায়, ওখান থেকে মেয়েদের বেছে-বেছে নিয়ে যায়; সেখানে চা খায়—জল-খাবার খায়—দু টাকা করে মজুরী পায়—গাড়ী চড়ে যায়—গাড়ী চড়ে ফেরে।

ভাবতে ভাবতে শান্তির রাগ-ক্ষোভ হতাশায় পরিণত হয়ে এল। কালবৈশাখীর ঝড়-মেঘ-বজ্র ক্রমে যেমন আষাঢ়ে মন উদাস করা বর্ষার মেঘে রূপান্তরিত হয়—দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্য্যন্ত নীরন্ধ্র মেঘে ঢেকে যায়—ঝর ঝর করে অবিরল কান্নার মত বৃষ্টি নামে—তেমনি ভাবে বুক-জোড়া বেদনার মেঘে রূপান্তরিত হল শান্তির ক্রোধ-ক্ষোভ, চোখ জলে ভরে উঠল—চোখ ছাপিয়ে দুটি ধারায় ক্রমে সে জল

নেমে এল। কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে কেঁদে—সে কোন মতে আত্মসম্বরণ ক'রে—ধরাগলায় কাতর ভাবে ডাকলে—ওরে আয়—বাড়ী আয়—আর দুঃখ দিস নে। ওরে দেবা—ওরে ট্যাবা । শেষের ডাক দুটির মধ্যে কান্নার সুর স্পষ্ট হয়ে উঠল। চোখ দিয়ে আবার জল গড়িয়ে পড়ল।

দেবা ট্যাবা উঁকি মারলে গলি থেকে।

—ফিরে আয়—আমার মাথা খা।

দুই ভাই এবার রাস্তার উপর এসে দাঁড়াল।

—আয় রে, কিছু বলব না—আয়। আর কেলেঙ্কারী বাড়াস নে।

কেলেঙ্কারী বই কি। এমন ছেলে—আর ভদ্রলোকের মেয়ে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে এই ডাকা—কেলেঙ্কারী বই কি ? ভাগ্য শান্তির—সামনের দোকানগুলো বন্ধ ; রাস্তায় আজ নারীদেহ-লোলুপ মানুষের ভিড় নাই বললেই চলে। নইলে তেরচা চোখে চেয়ে চলতে চলতে কেউ হয়তো—সশব্দে গলা পরিস্কার করে ইঙ্গিত করত, কেউ হয়তো সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলত—কি গো—। খুনোখুনি—হাঙ্গামার মধ্যে কলকাতার মানুষের মতি ফিরেছে। মানুষের ভাগ্য না—হোক—শান্তির কাছে সেটা আজ ভাগ্যের কথা।

দেবা ট্যাবা এগিয়ে আসছে এক পা—এক পা করে।

*　　*　　*　　*

শান্তি ওদের মারলে না। মারতে ইচ্ছা হ'ল না। নেবুর মৃত্যুশোক বুকের মধ্যে চেপে হতাশার অবসাদে অবসন্ন হয়ে সেই দাওয়ার উপর বসে পড়ল। দেবা ট্যাবা সাহস পেয়ে দেখালে—তাদের পুটুলীর জিনিষ। পোড়ানো লরীর পার্টস। লরীতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে—।

—জানো মা—প্রথমেই গাড়ী থেকে খানিকটা পেট্রোল বার করে নিয়ে—টায়ারের উপর ঢেলে দিচ্ছে। বাস, তার পরই দেশলাই। পেট্রোলে আগুন লেগে—হু হু করে জলছে—টায়ারের রবার গলে যাচ্ছে—তখন সেই থেকে আগুন জলছে। তখন সট্ সট্ করে—লরীর ঘড়ি মিটার ব্যাটারী খুলে নিচ্ছে। তার পর ট্যাঙ্ক ফেটে পেট্রোল ছড়িয়ে পড়ে—খুব আগুন জলছে।

ওরা দু ভাইয়ে দুটো ঘড়ি নিয়ে এসেছে। ট্যাবা বললে—হাঙ্গামা মিটলে বিক্রী করে দোব।

শান্তির এতে খুসী হবার কথা। এর আগে মূল্য আনতে পারে এমন জিনিষ আনলে সে খুসীই হয়েছে। ওই ট্যাবাটা মধ্যে মধ্যে খবরের কাগজের প্রেস-রুমে ঢুকে কতক গুলো ব্লক চুরি ক'রে এনেছিল। গোপেন সেগুলোকে বিক্রী করে কিছু মূল্য ঘরে এনেছিল। শান্তি মধ্যে মধ্যে ট্যাবাকে বলে—এক দিনে বেশী আনবি নে, একটা দুটো—তার বেশী না। নইলে ধরে ফেলবে। পাড়ায় খাওয়ান দাওয়ান থাকলে দেবা ট্যাবা দুজনেই যায়—সুযোগ মত জুতো নিয়ে আসে। সেটা ওদের শিখিয়েছিল—নেবু।

হতভাগী নেবু।

এই সময় ফিরল গোপেন। একখানা সেলুন বডি মোটর এসে দাঁড়াল। সেই গাড়ী থেকে একটি লম্বা দেখতে জোয়ান ছেলে আর একটি হাল ফেশানী মেয়ে তাকে পৌঁছে দিয়ে গেল। খোঁড়াতে খোঁড়াতে দাওয়ায় এসে বসে বললে—এই আমার বাড়ী। বাস্ বলে ধপ ক'রে দাওয়ার উপর বসে পড়ে হাসতে হাসতে বললে—জয় হিন্দ!

মেয়েটি হেসে হেসে বললে—জয় হিন্দ। কিন্তু কাল যেন আর বাড়ী থেকে বার হবেন না।

—ও কিছু না! বলে গোপেন বাঁ পায়ের কাপড়টা সরালে—পায়ের ডিমেটায় একটা ব্যাণ্ডেজ।

—কিছু না নয়, কাল বুঝতে পারবেন। বিশ্রাম নিন কাল। জ্বর-টর হলে ডাক্তার দেখাবেন। পারি তো আমরা কেউ আসব ডাক্তার নিয়ে।

তারা চলে গেল।

স্তব্ধ হয়ে বসেছিল শান্তি মাটির মূর্ত্তির মত। তার মুখের ভাবের মধ্যে এমন কিছু ছিল—যা দেখে গোপেন তাকে একটু তোষামোদ না করে পারলে না। হেসে বললে—পায়ের ডিমেতে রিভলভারের গুলী লেগেছে।

শান্তি কোন উত্তর দিলে না। গোপেন এবার ঘরের ভিতরের দিকে মুখ ফিরিয়ে ডাকলে—নেবু, নেবু রে!

শান্তি এবার বলে উঠল, পাগলের মত—নেবু, নেবু, নেবু! নেবু নাই—নেবু মরেছে।

* * *

শেষ রাত্রে শান্তি ঘুমিয়ে পড়ল। বাইরের এই হাতখানেক চওড়া রোয়াকটায় বসে—ছিটে বেড়ার দেওয়ালের ঠাণ্ডা মাটীতে ঠেস দিয়ে—নেবুর চিন্তার উদ্বেগ বুকে নিয়ে তার ঘুম আসাটা আশ্চর্য্য। কিন্তু তবু ঘুম এল; বসে থাকতে থাকতে কখন আপনিই চোখের পাতা দুটো বন্ধ হয়ে এল। সজ্ঞানে যে সব রোগী মরে, বাঁচবার ব্যগ্রতায় অহরহ পাশের আত্মীয়-স্বজনদের দিকে তাকিয়ে থাকে—তারা যেমন ধীরে ধীরে ক্ষয়িতশক্তি হয়ে আপনার অজ্ঞাতসারে বিনা আক্ষেপে এক সময় চরম অবসাদে চোখ বন্ধ ক'রে, তেল ফুরানো প্রদীপের শিখার নিবে-যাওয়ার মত চেতনা হারিয়ে যায়, শান্তির ঘুম আসাটা ঠিক তেমনি ধরণের। ক্রমশঃ মাথার

ভিতরটা ঝিমিয়ে এল—ঝিম ঝিম করতে আরম্ভ করলে—হাত-পায়ের পেশীগুলো নরম হয়ে এল—নিজের দেহটা ভারী বোধ হতে লাগল, বুকের ভিতরে উদ্বেগের অসহনীয়তা কম অনুভব করতে লাগল, নেবুকে যেন ভুলে যেতে লাগল ক্ষণে ক্ষণে, পথের দিকে যে ব্যাকুল দৃষ্টিতে চেয়ে বসেছিল, সে দৃষ্টি ক্রমে নিস্পৃহতায় বাহ্যবস্তু-প্রতিবিম্বিত-করার চিহ্ন হারিয়ে ভাবলেশহীন হয়ে এল, পাতা দুটো নেমে এল। তবু বার কয়েক জোর করে—সে চোখ মেলবার চেষ্টা করলে, বার কয়েক চোখের পাতা খুললে, তার পর আর সে শক্তি রইল না, দৃষ্টি আর খুললে না। নাকের নিশ্বাস তখন ভারী হয়ে এসেছে।

গোপেনের ঘুম কিন্তু এল না। পায়ে গুলী লেগেছে, সেই যন্ত্রণা তাকে জেগে থাকতে সাহায্য করেছে। ক্রমাগত বিড়ি টানছে আর বসে আছে পথের দিকে তাকিয়ে। নেবুর অন্তর্দ্ধান সম্পর্কে ক্রমশঃ তার অন্য রকম ধারণা হচ্ছে। শান্তি বলেছে—নেবু, দেবা ট্যাবাকে খুঁজতে বেরিয়ে ফেরেনি। গোপেনের মনে হচ্ছে—নেবু নিশ্চয় কারও সঙ্গে ঘর থেকে চলে গিয়েছে। সন্দেহ হয়েছিল এ-বাড়ীর কানুটার উপর। কিন্তু কানুটা ফিরে এল। তার সাজ-পোষাক-চেহারা দেখে গোপেন বুঝতে পারলে—নেবুকে নিয়ে বিলাস-ব্যভিচার করতে যাওয়ার মত পোষাকও তার নয়—চেহারাও তার নয়। কলকাতার উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্য্যন্ত আজ দু দিন সে ঘুরছে, আজ সে দেখলেই বুঝতে পারছে, এর বুকে এই মাতন লেগেছে কি না? গাজনের ভক্তদের রুক্ষ চুল, শুকনো মুখ, গলার উত্তরী, হাতের বেত, গেরুয়া কাপড়, কপালে রক্তচন্দনের ছাপ দেখে যেমন চিনতে ভুল হয় না—তেমনি কানুর সর্ব্বাঙ্গেও সে এই গাজনের ভক্তসাজের ছাপ দেখতে পেয়েছে। তবে? মনে

হল—নেবু হয় তো দেবা ট্যাবাকেই দেখতে বেরিয়েছিল—অন্ধকার জনবিরল পথে দুষ্টু লোকের দল কিশোরী মেয়ে দেখে ধরে নিয়ে গিয়েছে। বুকের ভিতরটা তার হু হু করছে। পায়ের যন্ত্রণায় সর্ব্বাঙ্গের স্নায়ু-শিরায় বেদনা সঞ্চারিত হচ্ছে। অসহনীয় ক্ষোভে-আক্রোশে মাঝে মাঝে জানোয়ারের মত চীৎকার করে উঠছে সে —আ। সুদীর্ঘ উচ্চারণে আক্ষেপ-আক্রোশভরা—আ—অথবা —হা—, ঠিক বুঝা যায় না। তার পর ফেলছে সে একটা সশব্দে দীর্ঘনিশ্বাস—হু—।—কাল সে বার হবে আবার—একটা ছোরা চাই। প্রচণ্ড অনুশোচনা হয় সঙ্গে সঙ্গে। রিভলভারটা হাতে পেয়ে ছেড়ে দিয়ে এল সে।

মনে পড়ে যায় মেয়েটিকে আর ছেলেটিকে। নেবু চলে যাওয়ার লজ্জাজনক এবং ক্ষোভজনক স্মৃতির মতই ওই মেয়েটি এবং ছেলেটির স্মৃতি তার কাছে অবিস্মরণীয়। অদ্ভুত মেয়ে—অদ্ভুত ছেলে। গল্পের ছেলে-মেয়ে যেন। অথচ মনে হচ্ছে চেনা মুখ, অত্যন্ত চেনা মুখ। কোথায় দেখেছে ঠিক করতে পারছে না, কিন্তু নিশ্চয় দেখেছে, বহুবার দেখেছে। সিনেমার সামনে কি এসপ্ল্যানেড কি গোলদীঘির ধারে সিনেট হাউসের সিঁড়িতে বা সামনে কি কফি-হাউসের দরজায় কি ট্রামে বা বাসে এক সিটে পাশাপাশি এদের দেখেছে। ছেলেটির মুখে সিগারেট, চকচকে ব্যাকব্রাশ করা চুল, পরনে শান্তিপুরে ধুতি—পাঞ্জাবী অথবা পেন্টালুন হাফসার্ট কাবলী স্যাণ্ডেল অথবা পাজামা কামিজ জহরকোট ছিল, মেয়েটির পরনে দামী রঙীন অথবা সাদা তাঁতের শাড়ী—রেশমী ব্লাউস—হিলতোলা জুতো ছিল—সামনেটা ফাঁপিয়ে চুলের পারিপাট্য, পিঠের দিকে বেণী অথবা ঢলঢলে আলগা খোপা কি এলো খোপা; মুখে পাউডার কাঁধে ঝুলানো চামড়ার ব্যাগ, দু-এক সময় বেঁটে ছাতাও যেন থাকে।

হাসিতে কৌতুকে ফেটে পড়তে দেখেছে কি গল্পগুজবে মত্ত দেখেছে। ওয়েলিংটন স্কোয়ার, শ্রদ্ধানন্দ পার্ক, দেশবন্ধু পার্কের মিটিংয়েও এদের দেখেছে। উস্কোখুস্কো চুল—আধময়লা পোষাক—হাতে ঝাণ্ডা। হঠাৎ মনে হ'ল, ডকের মজদুরদের মধ্যেও এদের ঘুরতে দেখেছে। ঠিক ঠাওর হচ্ছে না—কিন্তু বহুবার সে এদের দেখেছে। হঠাৎ মনে হ'ল—খিদিরপুর থেকে কালীঘাট হয়ে আসবার সময় বড় জেলখানাটার ফটকের ধারে এদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে; ফুলের মালা হাতে নিয়ে কারুর জন্যে দাঁড়িয়েছিল কি ওরাই ফুলের মালা গলায় দিয়ে দাঁড়িয়েছিল—ঠিক মনে পড়ছে না তার। অত্যন্ত তিক্ত মনোভাব পোষণ করতো সে এতদিন এদের সম্পর্কে; ছেলেটিকে বলত—নটবর, মেয়েটিকে বলত—বিরহিণী। আজ কিন্তু সব ধারণা পাল্টে গেল তার। যাদের মনে করত ছাই—তাদের ছুঁয়ে বুঝতে পেরেছে—ছাইয়ের তলায় গনগনে আগুন ধ্বক-ধ্বক করছে।

ভবানীপুরে জগুবাজারে ওদের দেখা।

আজ সকালে পাড়ায় লোকের হায় হায় শব্দ শুনে ঘুম ভেঙ্গে উঠছিল গোপেন, বাড়ীতে ছোট বাচ্চা দুটো ছাড়া কেউ ছিল না। ঘরে ছিল শেকল লাগানো। খুলে দিলে এক জন পড়শী তারই কাছেই শুনলে শ্যামবাজারের পাঁচমাথায় গুলী চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে সে জামাটা টেনে নিয়ে গায়ে দিতে দিতেই বেরিয়ে পড়েছিল। শ্যামবাজার থেকে কালীঘাট। মঙ্গলবার রাত্রে সে কালীঘাটের ট্রাম ডিপোর আগুন দেখে মাথায় ঢেলা খেয়ে বাড়ী ফিরেছিল; সেই থেকে কালীঘাট তাকে টানছিল। ভবানীপুরে জগুবাজারে এসে সে থমকে দাঁড়াল। রাস্তায় ব্যারিকেড। ফুটপাথে একটা রাস্তার জংশনে চার মাথায় মানুষ জমেছে। থমকে দাঁড়াল

গোপেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই চোখে পড়ল এখানে-ওখানে শিখের দল। বাচ্চার দল। ঢেলা হাতে তৈরী। একখানা লরী পুড়ে গিয়েছে—এখনও অল্প অল্প ধোঁয়া উঠছে ; গুর্খা-পুলিশ কয়েকবার কাঁদুনে গ্যাস ছেড়ে গিয়েছে। একবার লাঠিও চালিয়েছে। গোপেন মনে মনে খুসী হয়ে উঠল! আর না এগিয়ে এইখানেই ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল। সর্ব্বপ্রথম সে সংগ্রহ করে নিলে একটা পোড়া লরী ভাঙ্গা লোহার মজবুত ডাণ্ডা। এরই মধ্যে গোপেন ছেলেটিকে দেখলে। এক সময় গোপেন চীৎকার করছিল পাগলের মত। হঠাৎ তার পাশে এসে দাঁড়াল ছেলেটি, বললে—এ রকম চীৎকার করে না। ডিসিপ্লিন না হলে কাজ হয় না। স্থির হয়ে থাকুন।

মুখের দিকে চেয়ে দেখলে গোপেন, বিরক্তি ছিল না ছেলেটির মুখে, হাসিমুখেই কথাগুলি বললে সে।

দুটোর পর আসর জমে উঠল। লোক জমল বেশী। শীতের দিনে শীত কেটে গরম হয়ে উঠেছে আবহাওয়া। ঝাঁকে ঝাঁকে ইট পড়তে লাগল। পুলিশের লরী আসে কিন্তু ঐ ইটের মধ্যে দাঁড়াতে পারে না, দ্রুত ফিরে যায়। গুলী চলল একবার। লাগল দু জনকে। আঘাত সামান্য। তাদের উঠিয়ে নিয়ে গেল আম্বুলেন্স। আবার খানিকটা যেন ঠাণ্ডা পড়ে গেল। আর পুলিশ মিলিটারীর লরী আসছে না। গোপেন চঞ্চল হয়ে পড়ল এবার। গোপেনের পেট জ্বলছে। সকাল থেকে পেটে দানা পড়ে নাই, পকেটে মাত্র দু আনা পয়সা। লোহার ডাণ্ডাটা হাতে নিয়ে গোপেন গলিগলি খানিকটা গিয়ে ভিতরের দিকের কোন রাস্তার ধারের চায়ের দোকান খুঁজছিল। আর খুঁজছিল চানার দোকান অথবা তেলেভাজার দোকান। দেশী চপ দেশী কাটলেট আলুর

বড়া আর বেগুনী। হঠাৎ নজর পড়ল একটা সরু গলির মোড়ে ছেলেটি কথা বলছে মেয়েটির সঙ্গে। একটা কিছু গভীর আলোচনা চলেছে, কৌতুক নয়—হাসি নয়। পাশ কাটিয়ে যাবার সময় গোপেন সম্ভ্রম প্রকাশ না করে পারলে না। হঠাৎ মেয়েটী ওকে ডেকে বললে—শুনুন।

—আমাকে বলেছেন? গোপেন চমকে উঠে ফিরে দাঁড়াল।

—হ্যাঁ। মাথায় আপনার রক্ত পড়ছে, কিসে লাগল?—ঢেলা?

সলজ্জ ভাবে হেসে গোপেন বললে—ওটা কাল লেগেছে ট্রাম-ডিপো পোড়ানোর সময়। ব্যাণ্ডেজটা খুলে গিয়েছে। কারও হাতের কনুয়ের ধাক্কা লেগে গেল এখুনি।

—না—না। ওটা বেঁধে ফেলা উচিত। এক কাজ করুন আপনি—

হঠাৎ রসারোডের উপর থেকে ভেসে এল জনতার চাপা গর্জ্জন, লরীর শব্দ, পিস্তলের গুলীর আওয়াজ। জনতা সরে আসছে—গলির ভিতর লুকিয়ে পড়ছে। ছুটে এল একটা ছেলে।

—একজন পড়ে গেছে গুলী খেয়ে। সার্জ্জেণ্টরা নেমেছে রাস্তায়।

ছেলেটী দ্রুতপদে এগিয়ে চলে গেল—রাস্তার দিকে।

মেয়েটী পিছন থেকে বললে—একটু কেয়ারফুলি।

ছেলেটী এবার একবার পিছন ফিরে একটু হাসলে শুধু। বললে—তুমি এস না কিন্তু। ওগুলোর ব্যবস্থা করে ফেল গিয়ে।

তবু মেয়েটী দু-চার পা এগিয়ে গেল, তার পর দাঁড়াল। গোপেনও বড় রাস্তার দিকে ফিরল। মেয়েটী বারণ করলে—না, যাবেন না এখন। দেখছেন না—লোকে পিছিয়ে গলির মধ্যে ঢুকছে? তা ছাড়া আপনার মাথায় জামায় রক্তের দাগ দেখলে এখুনি গুলী করবে। এ কি? তার কথাকে ঢেকে দিয়ে তাদের

চকিত করে তুলে একটা পিস্তলের আওয়াজ উঠল ; মেয়েটী বললে —এ কি ?

ঠিক এই মুহূর্ত্তটীতে—একটু আগে—অত্যন্ত কাছে গুলীর শব্দ। বাঁ পাশের একটা ছোট রাস্তা থেকে বিদ্যুদ্বেগে ছুটে মোড় ফিরল একটা বারো-চৌদ্দ বছরের ছেলে। সঙ্গে সঙ্গে কঠিন শব্দ তুলে একটা গুলী গিয়ে লাগল রাস্তাটার ওপারের একটা বাড়ীর দেওয়ালে —খানিকটা চুণ বালি ইট খসে গেল। ভারী জুতোর দৌড়ের আওয়াজ এগিয়ে আসছে। খুব বেঁচে গিয়েছে ছেলেটা। মেয়েটী গোপেনকে বললে—লুকিয়ে পড়ুন। ছেলেটাকে ডাকলে— আমার পিছনে বাঁ পাশের গলিতে।

গোপেন ঢুকে পড়ল সরু গলিটার মধ্যে ; বাঁ পাশে দুটো বাড়ীর মধ্যে একফালি অন্ধকার জায়গা—সেইখানে সে দেওয়ালের সঙ্গে মিশে দাঁড়িয়ে রইল। মুহূর্ত্তে গলির ভিতর ঢুকে গেল পলাতক ছেলেটা। তার পিছনে পিছনে ধীর পদক্ষেপে এসে দাঁড়াল মেয়েটী। গলির সামনে দ্রুত এগিয়ে এল ভারী বুটের আওয়াজ। এবার মেয়েটী ঢুকল গলির ভিতর। বুটের আওয়াজের মালিককে এবার দেখতে পেলে গোপেন। একজন সার্জ্জেণ্ট— হাতে রিভলভার। মেয়েটী গোপেনকে অতিক্রম করে গলির ভিতরে চলে যাচ্ছে—তেমনি মন্থর পদক্ষেপে, পিছন ফিরে তাকাচ্ছে না। বুঝতে পারলে গোপেন—ছেলেটাকে পিছনের রিভলভারের নলের মুখ থেকে আড়াল করে চলেছে ও। অদ্ভুত বুদ্ধি—অদ্ভুত সাহস। বিস্মিত হয়ে গেল গোপেন। মেয়েদেরও ওরা যে রেয়াৎ করছে না—গোপেন আজই চোখে দেখে এসেছে পথে। আসবার সময় কলকাতা মেডিকেল ইস্কুলের হাসপাতালে ব্যাটনের আঘাতে আহত একটী ষোল সতের বছরের মেয়েকে নিয়ে আসতে দেখেছে।

এই এমনি ধরণের মেয়ে—এই জাত। তার [illegible] উষারাণী বসু। তাকে ভর্ত্তি করবার সমস্ত সময়টা সে সেই[illegible]ছিল। নামটা সে শুনেছে—মুখস্থ করে ফেলেছে। এ মেয়েটীও নিশ্চয় তা জানে। তবু পিঠের কাছে রিভলভারের নল নিয়ে ছেলেটাকে বাঁচিয়ে চলেছে নির্ভয়ে। একবার ফিরেও তাকাচ্ছে না।

—ষ্টপ। Stop—এবার চীৎকার করে উঠল সার্জ্জেণ্টটা।

মেয়েটী কিন্তু দাঁড়াল না।

—ইউ আর আণ্ডার এ্যারেষ্ট, ইউ—ষ্টপ—। আই সে—

মেয়েটী তবু দাঁড়াল না। কথা যেন কানেই যাচ্ছে না ওর।

—এবার আমি তোমাকে গুলী করব, নইলে দাঁড়াও। চীৎকার করে উঠল সার্জ্জেণ্টটা। এবার গোপেনের রক্ত টগবগ ক'রে ফুটে উঠল। সে আর আত্মসম্বরণ করতে পারলে না, লোহার ডাণ্ডাটা শক্ত মুঠোয় ধরে সে গর্জ্জন করে বেরিয়ে এল আড়াল থেকে, ঠিক সার্জ্জেণ্টটার পিছনে। চকিত হয়ে সার্জ্জেণ্টটা গোপেনের দিকে ফিরতে চেষ্টা করতেই সে তার ওই ডান কাঁধেই বসিয়ে দিল লোহার ডাণ্ডার আঘাত। অত্যন্ত শক্ত আঘাত। লোকটা পড়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে হাতের রিভলভারটাও হাত থেকে খসে মাটীতে ঠুকে পড়ে গেল গলির উপর। মুহূর্ত্তে আওয়াজ হয়ে গেল, গুলীটা গোপেনের পায়ের ডিমের অল্প একটু মাংস ভেদ করে চলে গেল। গোপেনের সর্ব্বাঙ্গে একটা যন্ত্রণার বিদ্যুৎ-প্রবাহ বয়ে গেল। অদ্ভুত মেয়ে, সে গোপেনের হাত ধরে টেনে গলির মধ্যে ঢুকে এঁকে-বেঁকে বেরিয়ে গেল আর একটা রাস্তায়। আবার গলি-গলি আর একটা রাস্তায়। তার পর একটা বাড়ীতে। সম্ভবতঃ এদের সেটা আড্ডা। আরও কয়েক জন সেখানে বসেছিল, তারাই ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলে। কিছুক্ষণ পর সেখানে এল ছেলেটী। খবর নিয়ে

এল — একজন গুলী খেয়েছে, বরেন্দ্রকুমার দত্ত তার নাম। বাইশ বছরের জোয়ান ছেলে। সেখানেই সে শুনলে—গত কাল সার্কুলার রোডের মোড়ে একটা বারো-চৌদ্দ বছরের ছেলে গুলী খেয়েছিল—বেয়নেটের খোঁচা খেয়েছিল; কালই মারা গেছে হাসপাতালে; নাম দেবব্রত। মরবার আগে সে এক গ্লাস জল চেয়েছিল। হাসপাতালের নার্স তার অবস্থা দেখে চোখের জল সম্বরণ করতে পারে নাই, কাঁদতে কাঁদতে সে জলের গ্লাস এগিয়ে দিয়েছিল। ছেলেটা তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল—কাঁদছ কেন? আমি দেশের স্বাধীনতার জন্য মরছি। এ মরণ তো ভাগ্যের মরণ। আমার দেশ—আমার দেশ স্বাধীন হোক।

গোপেন বার বার সেই কাহিনী স্মরণ করছে।

নেবু যেন গুলী খেয়ে মরে গিয়ে থাকে। গোপেনের মত বাপের ঘরের দুর্ভাগ্য থেকে মুক্তি নিতে সে যেন দেশের জন্য মরে —দেশের পথের উপর পড়ে থাকে।

সকাল হয়ে আসছে। ১৪ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতি বার। গোপেন উঠে দাঁড়াল। মরা নেবুর সন্ধানে যেতে হবে। কিন্তু এ কি—মাটী টলছে—সব ঘুরছে যে। গোপেন আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করল দেওয়ালটা, কিন্তু কই, কোথায় দেওয়াল? সে পড়ে গেল উপুড় হয়ে।

* * * *

কানু সেই দরজার মুখে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিল। শীতের শেষ রাত্রির ঠাণ্ডায় পথের কুকুরের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে একটা কাতর সরীসৃপের মত পড়েছিল। গাঢ় ঘুম নয়, অবসন্নতার তন্দ্রাচ্ছন্নতা, তন্দ্রাচ্ছন্নতার মধ্যেও নেবুর জন্য চিন্তা তার মস্তিষ্কের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল; বুকের মধ্যে উদ্বেগও তাকে পীড়িত করছিল

—অবসন্ন তন্দ্রাচ্ছন্ন রোগীর রোগযন্ত্রণার মত। ভোর বেলাতেই তার তন্দ্রা ভেঙে গেল; ঠিকের ঝি পাড়াতে অতি নিকটেই থাকে, কাছের বাড়ীর কাজ তারা সর্ব্বাগ্রে সেরে দিয়ে যায়; সেই ঠিকের ঝিয়ের চীৎকারে তার তন্দ্রা ভেঙে গেল। এমনি ভাবে দরজার গোড়ায় কানুকে পড়ে থাকতে দেখে সে আঁত্‌কে চীৎকার করে উঠেছিল। কলকাতা শহর—এখানে মানুষের প্রাণের চেয়ে আর সস্তা কি? তার উপর এই খুনোখুনির দিনের কলকাতা—১৯৪৬ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী। গত তিন দিনে মানুষ মরেছে—গুলী খেয়ে জখম হয়েছে, এ ছাড়া খবর নাই। রকমারি গুজবে কলকাতার আকাশ-বাতাস ভরে রয়েছে। কানুকে এই ভাবে পড়ে থাকতে দেখে ঝি বেচারী ভেবেছিল—কেউ হয়তো কানুকে খুন করে গিয়েছে; হয়তো রাস্তাতেই গুলী খেয়ে মরেছিল ছেলেটা,—লোকজনে রাত্রে লাসটা এনে ফেলে দিয়ে গিয়েছে। চীৎকার করে কয়েক পা পিছিয়ে গেল সে। চীৎকারে তন্দ্রাচ্ছন্ন মস্তিষ্কের মধ্যে অর্দ্ধসুপ্ত নেবুর কণ্ঠস্বরের স্মৃতিকে জাগ্রত করে দিলে। মস্তিষ্কের স্নায়ুজালের মধ্যে উত্তেজনার শিহরণ ব'য়ে গেল; শিরায় শিরায় রক্তপ্রবাহ দ্রুতগতিতে বইতে আরম্ভ করলে। নেবু! নেবু! বিদ্যুৎ-প্রবাহ সঞ্চারিতের মত সে উঠে বসল।

বাড়ীর ভিতর থেকে কানুর মা সাড়া দিলেন—কে গো? কি হ'ল? তিনিও উৎকণ্ঠিত হয়ে রয়েছেন কানুর জন্য। তবে কানু এমন অনেক দিন অনুপস্থিত থাকে রাত্রে। বারোয়ারী পূজোয় সে ভলেন্‌টিয়ারী করে—রাত্রে ফেরে না। সরস্বতী পূজোর তো কথাই নাই। কয়েক দিন ধরেই তার দেখা মেলে না। শিব-চতুর্দ্দশীতে সারারাত্রিব্যাপী সিনেমা শোতে আটটায় গিয়ে সকালে ফেরে। মধ্যে মধ্যে পিকনিকে যায়—সকালে গিয়ে ফেরে রাত্রি বারোটায়

—কখনও কখনও ফেরে তার পরদিন। আবার কখনও রোগীর সেবা করতেও যাও। সারা রাত্রি জেগে সকালে ক্লান্ত দেহে বাড়ী ফেরে। বলে—কি করব? সেবা করবার লোক নেই। পথে শুনলাম, দেখতে গিয়ে আর ফেরা হ'ল না। মোট কথা, কানু যদি রাত্রে না ফেরে তবে ভাবনা-চিন্তা না করাটাই কানুর মায়ের অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। ফিরতে দেরী হলে খাবার ঢাকা দিয়ে তাঁরা শুয়ে পড়েন, কানুর ডাক শুনবার জন্য উৎকণ্ঠা পোষণ না ক'রেই ঘুমোন, ডাকলে দরজা খুলে দেন, না-ডকলে ঘুম ভাঙে যথানিয়মে সকালে, তখন মনে মনে কঠিন তিরস্কার করবার সংকল্প করেন, কঠিন কথাও অনেক ভেবে রাখেন মনে মনে, কিন্তু কানু ফিরলে আর কোন কথাই ওঠে না; সহজ ভাবেই তাকে গ্রহণ করেন। এ সব সত্ত্বেও গত রাত্রে কানুর মা উৎকন্ঠিত না হয়ে পারেন নাই। কয়েক বারই তাঁর ঘুম ভেঙেছে। আজ ভোরে তাই ঘুম ভাঙতে কয়েক মিনিট বিলম্ব হয়েছিল। ঝিয়ের চীৎকারে—ঘুম ভেঙে কানুর মা প্রশ্ন করলেন—কি গো? কি?

—আমি মা। দাদাবাবু দোর-গোড়ায় শুয়ে রয়েছে। আমি মা—ভয়ে বাঁচি না।

—কে কানু?

—হ্যা গো! ঝগড়া হয়েছে বুঝি? ওই—ওই ও দাদাবাবু—চল্লো কোথা গো?

কানুর মা দ্রুতপদে এসে—দরজা খুলে বেরিয়ে এসে ডাকলেন—কানু—কানু! আবার যাচ্ছিস্ কোথায়?

—আসছি! রূঢ় কঠিন কণ্ঠস্বরে উত্তর দিয়ে কানু বেরিয়ে চলে গেল।

নেবুর সন্ধান করতেই হবে।

রাস্তার মোড়ে রাইফেল নিয়ে ঘুরছে বৃটিশ টমি। সিগারেট ফুঁকছে। বড় বাড়ীটার বারান্দায় বুক দিয়ে ঝুঁকে—দশ-বারো জন চেয়ে রয়েছে রাস্তার দিকে। কানুর মনে হল—ঘৃণা-ভরা আক্রোশ ফুটে রয়েছে ওদের নীলাভ চোখে! এইবার সে দাঁড়ালে—তার পর একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে আবার চলতে আরম্ভ করলে। বিমল—নরেন—এদের ডাকতে হবে। সকলে যাবে। পাতি-পাতি ক'রে খুঁজে যেখান থেকে হোক বার করবে নেবুকে।

পাঁচ-মাথার মোড়ে গোলাকৃতি জায়গায় গোরা পুলিশ পাহারা দিচ্ছে। কানুর মাথার ভিতরটা ক্ষোভে রাগে কেমন হয়ে উঠল। নির্য্যাতিত ঘোড়া যেমন অকস্মাৎ বিদ্রোহে রাশ-যুতি টান মেরে ছিঁড়ে গাড়ীর সঙ্গে সকল বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে লাফ দিয়ে উন্মত্ত বেগে ছুটে চলে সামনের সকল কিছুকে মাড়িয়ে—ধাক্কা দিয়ে—তেমনি বিদ্রোহ জেগে উঠছে যেন ওর উত্তপ্ত মস্তিষ্কের মধ্যে, উদ্বেগ-পীড়িত মনের মধ্যে।—শালা! থমকে দাঁড়াল কানু! বিড়-বিড় করে গাল দিচ্ছে আপনার মনে।

সেণ্ট্রাল এ্যাভিনিউ হয়ে—নিউ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট ধরে একখানা গাড়ী এল। কংগ্রেস-লীগ ঝাণ্ডা পাশাপাশি বাঁধা। মাইক্রোফোন এবং লাউডস্পীকার লাগানো। ঘোষণার শব্দ অনেকটা দূর থেকেই শোনা গেল। কানু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল। গাড়ীতে দুজন লোক—একজন হিন্দু এক জন মুসলমান—সামনে ড্রাইভার এবং আর এক জন। শহরে ১৪৪ ধারা জারী হয়েছে। চার জনের বেশী একসঙ্গে থাকলে বে-আইনী হবে। এগিয়ে এল গাড়ীখানা।

"কংগ্রেস এবং লীগের কর্ত্তৃপক্ষ সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছেন—আপনারা এই ধরণের উন্মত্ততা থেকে ক্ষান্ত হোন। এতে

আমাদের ভাবী বৃহত্তর সংগ্রামের পক্ষে ক্ষতিই হচ্ছে। বৃহত্তর সংগ্রাম আসছে। আপনারা রাস্তার ধারে সমবেত হয়ে জনতার সৃষ্টি করবেন না। কোন প্রকার হিংসাত্মক কাজ করবেন না, কাউকে করতে দেখলে তাকে বারণ করবেন—নিরস্ত করবেন তাকে।”

গাড়ী চলে' গেল।

কানু ব'সে পড়ল একটা দোকানের সিঁড়ির উপর। হতাশার অবসাদে সে যেন এক মুহূর্ত্তে ভেঙে পড়ল। চারি পাশে ফুটপাথ আজ প্রায় জনশূন্য। হঠাৎ সে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

সামনে প্রশস্ত রাজপথে আজ কয়েক দিন ঝাড়ু পড়ে নাই—ধুলোয় আবর্জ্জনায় পথটা সমাকীর্ণ হয়ে রয়েছে! শীতের সকালে উত্তরের বাতাসে খড়-কুটো ঝরাপাতাগুলো থরথর করে কাঁপছে, ধুলো উড়ছে মধ্যে মধ্যে।

হঠাৎ এক দল লরী এসে পড়ল গর্জ্জন করে। এক সারি মিলিটারী লরী। আর্মার্ড কার। ইস্পাতের ঘরের মত গাড়ীর বডির ছাদে একটা গোল গর্ত্ত থেকে এক এক জন ইংরেজ সৈনিক টমিগান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রথম গাড়ীখানার ড্রাইভারের পাশে এক জন বড় একখানা শহরের ম্যাপ খুলে বসে আছে। তারই নির্দ্দেশ মত গাড়ীর সারি চলছে। মোড়ের মাথায় এসে তিন ভাগ হয়ে গেল গাড়ীর সারি। এক ভাগ চলে গেল সার্কুলার রোড ধরে, এক ভাগ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট হয়ে গ্রে ষ্ট্রীট হয়ে গিয়ে পড়বে সেণ্ট্রাল এ্যাভিনিউয়ে। এক ভাগ চলে গেল নিউ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট ধরে। ধীর-মন্থর গতিতে চলেছে। চারি দিকে সতর্ক সদর্প দৃষ্টিতে চেয়ে চলেছে।

কানুর দৃষ্টিতেও দেখতে দেখতে ভয়ের অভিব্যক্তি ফুটে উঠল। পা দুটো যেন কাঁপছে। অনেকক্ষণ সে চুপ ক'রে বসে রইল। তারপর

ধীরে ধীরে উঠল। বাড়ী ফিরতেই ই... ...চ্ছিল—কিন্তু চলল সে মাণিকতলার দিকে।

কই নেবু? কোথায় নেবু!

রাত্রের অন্ধকারে দেখা—তবু চিনতে পারলে কানু। হ্যা সেই। কানুর মতই অস্থির হয়ে ফিরছে। ভয়—নিষেধ তার জীবনের গতিবেগের পথে অবরোধের সৃষ্টি করেছে—সেখানে ধাক্কা খেয়ে চারি পাশে ঘুরে ঘুরে—গতিবেগকে ক্লান্ত ক'রে নিচ্ছে। ঠিক চিনলে কানু! কাল রাত্রে নেবুকেই এই ছোকরা বলেছিল—"লালবাজারমে হিন্দু-মুসলীম এক হো গেয়া পাইজা।" কানু তার হাত ধরলে।—'কাল রাত্রে তোমার পাশে ...য়ে ঢেলা ছুড়েছি আমি, চিনতে পারছ?'

চমকে উঠল ছোকরা,—কে তুমি?—চোখের দৃষ্টিতে চকিতে পর পর ফুটে উঠল—ভয়—অবিশ্বাস—হিংস্র আক্রমণোদ্যোগ। কিন্তু কানুর হাতের স্পর্শের মধ্যে চেপে ধরে আয়ত্ত করবার চেষ্টা ছিল না—বরং ছিল শিথিল ভঙ্গির মধ্যে মিনতির স্পষ্ট প্রকাশ। নইলে হয়তো কিছু ঘটে যেত।

কানু বললে—আমার সঙ্গে সেই শিখের ছেলেটি ছিল। যাকে তুমি বললে—পাইজী, লালবাজারমে হিন্দু-মুসলীম এ... হো গেয়া।

সে স্থিরদৃষ্টিতে কানুর দিকে চেয়ে বললে—ঝুট বা...! শিখের ছেলে?

—শিখের ছেলে নয়, সে মেয়েছেলে। বল সে কোথায়? কাল রাত্রে এখান থেকেই আর তাকে পাইনি। বল—!

—নাম কি তোমার?

—কানু। কানাইলাল বোস।

একটু স্তব্ধ হয়ে থেকে সে বললে—তোমার নাম করেছিল সে। একবার হোস হয়েছিল। মরবার ঘণ্টাখানেক আগে?

—নেবু—? নেবু নাই? ম'রে গিয়েছে?

—পেটে গুলী লেগেছিল।

—কিন্তু—মরা-নেবু কই? কোথায়?

—দেখবে। কিন্তু সে এখন নয়। সন্ধ্যের পর।

রাত্রি দশটারও পর ইসমাইল তাকে দেখাতে নিয়ে গেল নেবুর মৃতদেহ। দশটার পর কানুকে সঙ্গে নিয়ে খালের ধারের দিকে চলল। সমস্তটা দিন কানু ইসমাইলের সঙ্গ ছাড়লে না, ইসমাইলই তাকে খাওয়ালে। অন্ধকার খালের ধারে একটা নির্জ্জন স্থানে এসে—দেখে—ঠাওর ক'রে একটা গাছের তলায় দাঁড়াল। বললে—দোস্ত, বিশ্বাস করো আমার কথা—খোদাতায়লার নাম নিয়ে আল্লা রসুলের নাম নিয়ে তোমাকে বলছি—সে ঠিক এই গাছটার সামনে বরাবর খালের জলের মাঝখানে আছে।

কানু তার হাত ধ'রে বললে—কি বলছ তুমি? ওইখানে ফেলে দিয়েছ?

—হ্যা। কি করব? অজানা অচেনা তার উপর মেয়েছেলে। কবর দিতে গেলে—সেখানে ডাক্তারের সার্টিফিট চাই সনাক্ত চাই—নাম লেখাতে হবে। একা তোমাদেরই ওই মেয়ে নয়—আমাদেরও এক জনকে ওখানে দিতে হয়েছে। ফেরারী আসামী ছিল সে।

কানু তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। অন্ধকারের মধ্যেও ইসমাইল অনুভব করলে সে কথা। সে বললে—সমঝ করো ভাই! আমার বাত বিশ্বাস করো।

কান্থ হঠাৎ নামতে লাগল—খালের পাড় ভেঙে জলের দিকে অগ্রসর হল। ইসমাইল তার হাত চেপে ধরলে—বললে—না।

—ছাড়। আমি দেখব।

—না। আমিও দিনের বেলা ভেবেছিলাম—আমিই জলে নেমে তুলে তোমাকে দেখাব। কিন্তু সে হয় না। খালে ছোট ইষ্টিমার চলে—কত জল জানি না। সে হয় না। আমি ঝুট বলি নাই তোমাকে। আমার ইমানদারিতে তুমি বিশ্বাস করো। এস, ফিরে এসো।

কান্থ হঠাৎ ইসমাইলের মুখের উপর হাত দিলে। গরম জলের স্পর্শ লাগল তার এই শীতের রাত্রের কনকনে হাওয়ায় ঠাণ্ডা আঙুলের ডগায়। কিছুক্ষণ দুজনেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। তার পর হঠাৎ কান্থ বললে—চল।

কলকাতার প্রান্তসীমায় খালের ধারের ধুলায় আচ্ছন্ন পথ, মাথার উপরে দু'পাশে বড় বড় গাছের আচ্ছাদন,—গ্যাস লাইট-গুলোর অধিকাংশই জলছে না; ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের উন্মত্ত কলকাতার পথে, বিশেষ ক'রে এই জনবিরল পথে আলো জ্বালবার জন্য কর্পোরেশনের উড়িয়া শ্রমিকেরা আসে নাই; বিদ্রোহের উত্তাপ তাদের বুকেও লেগেছে—সেই উত্তাপে তাদের মনও আজ দৈনন্দিন কর্ম্মের দিকে নাই; বিদ্রোহের উত্তাপের সঙ্গে ভয়ও আছে—এই দুই বিপরীতধর্ম্মী ভাব মিশ্রণের ফলে তারা মাত্র খালের উপর ব্রিজগুলির ধারে আলো জেলে দিয়ে এ পথে আর অগ্রসর হয় নাই—আপন-আপন আড্ডায় ফিরে গিয়ে এই হত্যাকাণ্ডের উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনা করছে। এতক্ষণ হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। বড় বড় গাছে ছাওয়া আলোকহীন অন্ধকার পথ। তারই মধ্যে দিয়ে দুটি অল্পবয়সী ছেলে চলেছে। ধূলার অনেক নীচে

পাথরে বাঁধানো রাস্তার অস্তিত্ব—সেই পথের উপরের তাদের পায়ের শব্দ তারা শুনতে পাচ্ছে। রাস্তায় জনমানব নাই। ব্রিজের মোড়ে মোড়ে যে পুলিশ পাহারা থাকে—তাও নাই। আজ তিন দিন বিদ্রোহী কলকাতার শক্তির কাছে পুলিশ-শক্তি পরাভব মেনে পিছু হেটেছে। অনেকে বিজ্ঞাপনে সন্দেহ করেন —দেশীয় পুলিশের মনও আজ বিদ্রোহীদের সঙ্গে সহানুভূতিসম্পন্ন। কেন হবে না? তারাও তো এই দেশেরই মানুষ। সেই জন্যেই তাদের সরিয়ে কর্ত্তৃপক্ষ এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সার্জ্জেন্ট, গুর্খা-পুলিশ এবং গোরা পল্টনের হাতে ছেড়ে দিয়েছে বিদ্রোহ-দমনে শক্তি প্রয়োগের অধিকার। তাদেরও কিন্তু এই অন্ধকার জনহীন খালের ধারের দিকে আসবার সাহস নাই। বড় রাস্তা ছাড়া কোন গলির মধ্যে তারা ঢোকে না। পিস্তল হাতে নিয়েও না; মানুষ আজ যেখানে মরতে ভয় পায় না, সেখানে পিস্তলের দাম কমে গিয়েছে এবং মানুষ সংঘবদ্ধ হওয়ায় তাদের শক্তির মূল্য বেড়েছে। যেখানেই অস্ত্রের অহঙ্কারে পুলিশ গলির মধ্যে ঢুকেছে, সেখানেই অহঙ্কার চূর্ণ হয়েছে, হয় পালিয়ে আসতে হয়েছে অথবা নির্য্যাতিত হতে হয়েছে। মার খেয়েছে—টুপি কেড়ে নিয়েছে—পোষাক ছিঁড়ে দিয়েছে। একটি সংবাদ খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছে যে, লেক অঞ্চলে টহল দিতে গিয়ে দুজন সার্জ্জেণ্ট ফিরে আসে নাই;—এক দল পুলিশ তাদের অনুসন্ধান করেও কোন সন্ধান পায় নাই এখনও পর্য্যন্ত। সাতাশী জন পুলিশ আহত হয়েছে এই তিন দিনে। আলোকোজ্জ্বল উৎসব-মুখর কলকাতা অন্ধকার শঙ্কায় ক্ষোভে থম-থম করছে। নিজের মনের প্রতিফলনে স্তব্ধ কলকাতার বস্তী থেকে আরম্ভ করে রুদ্ধদ্বার বড়

প্রাসাদগুলি অবরুদ্ধ শোকার্ত্ততায় নিশ্চল ক্ষোভে বিষণ্ণ এবং বাক্যহারা হয়ে ঊর্দ্ধমুখে শূন্যলোকের মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজছে বলে মনে হ'ল ইসমাইল এবং কানুর।

বরেণ্য দেশনায়কের সতর্ক বাণী—নিষেধাজ্ঞায়, নিরস্ত্রের উপর আগ্নেয়াস্ত্রের শাসনে মানুষ বল হারিয়ে ফেলছে, অভিভূত হয়ে শিথিল-পেশী হয়ে পড়েছে বিদ্রোহ। যে কলকাতা উন্মত্তের মত বিকৃত মুখে রক্ত চক্ষে উদ্ধত মস্তকে শিকল ছিঁড়তে উঠে দাঁড়িয়েছিল, সে এই নিষেধাজ্ঞায়—শাসনের নির্ম্মমতায় নতজানু হয়ে আবার বসে পড়েছে—মাথা নীচু করেছে। যে মাথা নীচু সে করেছে মাটির দিকে নিবদ্ধ-দৃষ্টি সে মুখের ছবি স্পষ্ট যেন ভেসে উঠছে কানুর মনে। অন্ধকারের মধ্যে ইসমাইলের মুখে হাত দিয়ে যেমন অনুভব করেছিল উষ্ণ অশ্রুধারার স্পর্শ—তেমনি স্পর্শ কলকাতার নতমুখে হাত দিলেই পাওয়া যাবে।

ইসমাইল হঠাৎ দাঁড়াল —মৎ যাও ভাই। দাঁড়াও।

কানু চকিত হয়ে ইসমাইলের মুখের দিকে চা[illegible]।

ইসমাইল আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে—মোড় প[illegible]লিটারী। নও জোয়ান দেখনেসেই গোলী চালায়েগা, নেহি এ্যারেষ্ট করেগা।

মাণিকতলার মোড়ে গুর্খা-পুলিশ এবং কয়েক জন ইংরেজ সৈনিক পাহারা দিচ্ছে। সাধারণের দিক থেকে আক্রমণ আজ আর হয় নাই। আক্রমণোদ্যোগ শিথিল হয়ে পড়েছে।

ঠিক কথা! ইসমাইল ঠিক বলেছ। কানু বললে—আমি গলি-গলি চলে যাচ্ছি।

—আজ এখানেই রহে যাও না ভাই।

—না ভাই। সমস্ত দিনই তো রয়েছি তোমার সঙ্গে। বাড়ীতে ভেবে সারা হয়ে যাবে।

হঠাৎ কানুর মনে পড়ে গেল মায়ের মুখ। দ্রুতপদে সে গলি-পথ ধরবে।

*   *   *

পনেরোই ফেব্রুয়ারী।

গোপেন উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে বসেছিল বাইরের সেই ফালি দেওয়ালটার উপর। গত কাল এক বেলা পুরো সে অজ্ঞান হয়ে ছিল। দুপুরের পর চেতনা হয়েছে। চেতনা হলেও সে উঠতে পারে নাই, ডাক্তার তাকে উঠতে দেয় নাই। চেষ্টা করবারও অবকাশ হয় নাই তার। বাকী সমস্ত দিনটা এবং রাত্রিটা তার অঘোর ঘুমের মধ্যে কেটে গিয়েছে। গোপেনের অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাওয়ার শব্দেই শান্তির ঘুম ভেঙেছিল।

নিষ্ঠুর অদৃষ্ট তার দুর্ভাগ্যের—দুর্ভোগের আর অন্ত নাই; হে ভগবান! কিন্তু ভগবানকে ডাকারও সময় ছিল না তার। গোপেনকে ধ'রে তুলতে হবে। সেও কি তার সাধ্য? দেবা ট্যাবাকে ডেকে তাদের সাহায্যেও সম্ভবপর হয় নাই। দুজন ঝি যাচ্ছিল তাদের ডেকে ধরাধরি করে ঘরে তুলে এনেছিল। মুখেচোখে-মাথায় জল দিয়েও চেতনা হয় নাই। অবশেষে ডাক্তার ডেকেছিল। নেবু খুলে রেখে গিয়েছিল তার কানের দুটো মরা সোনার টাপ, রূপোর চুড়ি চার গাছা—তাই বন্ধক দিয়েছে ওই ঝিয়ের বস্তীর জগো মাসার কাছে! জগো মাসী শোকে অভিভূত হয়ে কাঁদছিল। তার কোলে-পিঠে ক'রে মানুষ করা মেয়ে, গুলী খেয়ে মরেছে কাল। গণেশ টকীর কাছে বাড়ী তাদের—তিন তলার উপরে জানলায় দাঁড়িয়ে চোদ্দ

বছরের মেয়েটি কৌতুহলী হয়ে দেখছিল এই সংঘর্ষ। সম্ভবতঃ লক্ষ্যভ্রষ্ট রাইফেলের গুলী গিয়ে লেগেছে তাকে। জগোর ধারণা কিন্তু ইচ্ছে করেই গুলী করেছে। তবু সে শান্তির মুখ দেখে—তার ব্যাকুলতা দেখে টাকা দিয়েছে। টাকা দিয়ে বলেছিল—আর যদি দরকার হয় তবে নেবুকে পাঠিয়ে দিয়ো। জিনিষ না হলেও দোব।

শান্তির বুক ফাটিয়ে চীৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হয়েছিল—ওরে নেবু রে! আমার সোণার নেবু রে! কিন্তু নিজেকে সে সংযত করেছিল। কলঙ্ক—দুরপনেয় কলঙ্ক দেশ ছেয়ে যাবে। নেবু ফিরে এলে ঘরে তার ঠাঁই হবে না। কথা প্রকাশ পেলে—আফিস পর্য্যন্ত গিয়ে পৌছিলে—গোপেনের চাকরী যাবে। জগোর কথার কোন উত্তর না দিয়েই সে এক রকম ছুটে পালিয়ে এসেছিল। ডাক্তারের কাছেও সে সত্য কথা বলে নাই। মাথায় ঢেলার আঘাত—পায়ে গুলির ক্ষত দেখে ডাক্তার প্রশ্ন করেছিলেন—কি ক'রে হ'ল? হাঙ্গামায় মেতেছিল বুঝি?

—না।

—তবে?

মুহূর্ত্তে শান্তির মাথায় এসে গেল মিথ্যা কথা। সে বললে—খিদিরপুর থেকে ফিরছিলেন—হাঙ্গামার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন। এদের ঢেলায় মাথা ফেটেছে, ওদের গুলী পায়ে লেগেছে।

অবিশ্বাসের কিছু নাই। ডাক্তার আর প্রশ্ন করেন নাই। তিনি দয়া করে ভিজিটও নেন নাই। ওষুদের দাম নিয়ে বলে গিয়েছেন—উঠতে দেবে না আজ। উঠতেও পারবে না, তা ছাড়া ঘুমের ওষুদ দিলাম।

জ্ঞান হওয়ার পর—গোপেন জিজ্ঞাসা করেছিল—নেবু ?

মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে জানিয়েছিল শান্তি—না।

—ফেরেনি ?

আবার মাথা নেড়েছিল শান্তি।

স্তব্ধ হয়ে শুয়ে ঘরের খাপরার চালের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে গোপেন ঘুমিয়ে পড়েছিল, নিরতিশয় ক্লান্তিতে, অবসাদে, ওষুদের প্রভাবে।

শান্তি উদ্বেগ-আকুল চিত্তে ঘরের দরজাটায় ঠেস দিয়ে বসে সমস্ত দিন কাটিয়েছে। এ-পাশে ঘরের মধ্যে ঘুমন্ত অসুস্থ গোপেন—ও-পাশে পথ, এখান থেকে প্রায় মোড়টা পর্য্যন্ত দেখা যায়।

দেবা আর ট্যাবা বাপের ওই অবস্থা দেখে এবং মায়ের মুখের দিকে চেয়ে আজ আর মাতনে মত্ত হ'তে যায় নাই। বাইরেও আজ উৎসাহ নাই যেন। দেবা ট্যাবা বার-দুয়েক তবু ঘুরে এসেছে বড় রাস্তার মোড় থেকে। দুপুরেই গিয়েছিল দুবার। একবার একটায়, একবার তিনটেয়। দুপুরে পরিশ্রান্ত শান্তিও ঘুমিয়ে পড়েছিল—গোপেনের অসুখ, নেবুর শোক তাকে জাগিয়ে রাখিতে পারেনি। স্নান করে দুটো ভাত মুখে দিতেই সে যেন ঢলে পড়ল ঘুমে।

নেবুর কথা তারা জিজ্ঞাসা করেছিল শান্তিকে। শান্তি তাদেরও সত্য কথা বলে নাই। বলেছে—কাল আমার বাবা এসেছিলেন দেশ থেকে—নেবুকে তিনি নিয়ে গিয়েছেন সঙ্গে। বর ঠিক করেছেন—বিয়ে দেবেন নেবুর।

—তোমার বাবা ? দাদামশায় ?

—হ্যাঁ।

দাদামশায় তাদের আছেন বটে। মধ্যে মধ্যে দাদামশায় আছেন, এ কথা তারা শোনে। কোন জেলায় কি গাঁয়ে যেন দাদামশায়ের বাড়ী; নদীর ধার, টিনের দেওয়াল, টিনের চাল, সুপুরী নারকেলের বন সেখানে; কি যেন নাম দাদামশায়ের। হ্যাঁ—হ্যাঁ—নবকৃষ্ণ মিত্র। মহাজনের গদিতে খাতা লেখে।

বিকেল বেলা প্রতিবেশীরা খোঁজ নিয়েছিল নেবুর।

—কেমন আছে তোমার স্বামী? কই নেবুকে দেখছি না?

তাদেরও শান্তি ওইকথা বলেছে। হঠাৎ পাত্র ঠিক করে এসেছেন। কি করব? উনি বাড়ী নেই, দেবা ট্যাবা বাইরে, এক ঘণ্টার বেশী ট্রেণের সময় নাই, নেবুকেই শুধু পাঠিয়ে দিলাম। এর পর আমরা যাব।

তার পর ঘরে খিল দিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে কেঁদেছে। তাও কি নিশ্চিন্তে কেঁদে বুক হাল্কা করার উপায় আছে? গোপেন অঘোরে ঘুমাতে ঘুমাতে মধ্যে মধ্যে দুঃস্বপ্ন দেখেছিল;—শান্তি চোখ মুছে তাকে নাড়া দিয়ে কপালে জল দিয়ে পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে দিয়েছে।

ভোর রাত্রে ঘুম ভেঙেছিল গোপেনের। শান্তি তখন ঘুমুচ্ছিল।

সকালে উঠে গোপেন বলেছিল—পুলিশে খবর দিই, কি বল?

শান্তি বলেছিল—তার পর? তোমার কাণ্ড যখন বেরুবে, দেবা ট্যাবার কাণ্ড যখন বেরুবে—তখন? চাকরী যাবে—হাতে দড়ি পড়বে—তা ছাড়া মেয়েরই যে কি কাণ্ড বার হবে তাই বা কে জানে?

চুপ করে বসে রইল গোপেন—এর কোন জবাব দিতে পারলে না।

শান্তি বললে—আমি পাড়ায় বলেছি, আমার বাবা এসে নেবুকে নিয়ে গিয়েছেন। দেবা ট্যাবাও তাই জানে।

* * *

সেই অবধি স্তব্ধ হয়ে বসে আছে গোপেন। মধ্যে মধ্যে বিড় খাচ্ছে। শরীরে এতটুকু শক্তি নাই—বুকের মধ্যে সে উন্মত্ততাও নাই। দেহে আঘাতের জর্জরতা—বুকে নেবুর অবরুদ্ধ শোকের হতাশা। পথে মানুষের জটলার মধ্যেও নিরুৎসাহের প্রভাব।

দেবা ট্যাবা মধ্যে মধ্যে বাইরে যাচ্ছে আবার ফিরে আসছে। ঘরের মধ্যে শান্তি আজ ভগবানকে ডাকছে।—হে ভগবান! এই করলে শেষে তুমি?

বার কয়েক শুনে গোপেন আর সহ্য করতে পারলে না, শান্তির ওই কাতর ভাবে ভগবানকে ডাকার মধ্যে যেন তারই প্রতি মর্ম্মান্তিক তিরস্কার প্রচ্ছন্ন রয়েছে বলে মনে হল—স্পষ্ট ভাবে না হলেও অস্পষ্ট ভাবে সেটা সে অনুভব করলে। তাই সে বলে উঠল—আঃ ছি-ছি-ছি! চুপ কর, তোমার পায়ে ধরছি আমি।

দেবা ট্যাবাও ক্রমে এই শোকাচ্ছন্নতায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। কারণ না-জেনেও তারা অভিভূত হয়ে পড়ল স্তব্ধ বিষন্নতার মধ্যে!

দিনে খেয়ে-দেয়ে গোপেন একটু সুস্থ হল। নানা উপায় সে ভাবতে লাগল। আঃ, সেই মেয়েটি আর ছেলেটির সঙ্গে যদি আর একবার দেখা হ'ত? তারা কি আসবে? কলকাতার এত ছেলে-মেয়ের মধ্যেই কি সে আর তাদের খুঁজে বার করতে পারবে? তবে আবার যদি হাঙ্গামা বাধে—তবে হাঙ্গামার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেই তাদের দেখা পাবে, এ বিষয়ে গোপেনের কোন সন্দেহ

নাই। গোপেন ভুল করবে না—নেবুর শোক তার বুকে গাঁথা রইল।

আঃ, একটা মানুষ নাই যে দুটো কথা বলে। গলির মোড় পর্য্যন্ত গেলে হয়! হঠাৎ তার নজরে পড়ল, কানু এসে দাঁড়িয়েছে নিজেদের বাড়ীর সামনে, গলিটার ভিতরের দিকে। সে ডাকলে —কানু।

কানু ধীরে ধীরে এগিয়ে এল।

—আজকের খবর কিছু জান?

মুখের উপর কোঁচার ডগাটা চেপে ধরেছে কানু, সম্ভবতঃ এখুনি সিগারেট খেয়েছে। মাথা নেড়ে কানু ইঙ্গিতে উত্তর দিলে—না।

—খবরের কাগজ নাও না তোমরা?

কানু নীরবেই চলে গেল, বাড়ী থেকে কাগজখানা এনে গোপেনের পাশে নামিয়ে দিলে।

অনেক খবর। সহরতলী অঞ্চলে হাঙ্গামার বিস্তার। বুধবারে কাঁকিনাড়া ও নৈহাটীতে চারখানা ট্রেণ ভস্মীভূত করে দিয়েছে উন্মত্ত জনতা। কাঁকিনাড়া ষ্টেশন পুড়িয়ে দিয়েছে। লাইনের উপর শুয়ে ট্রেণ চলাচল বন্ধ করবার চেষ্টা করেছে। কাঁকিনাড়ায় গুলীতে মরেছে চার জন, চৌদ্দ জন আহত হয়েছে। হাওড়ায় শালিমারে শ্রমিকেরা কাজ বন্ধ করেছে। বুধবারে উন্মত্ত জনতা কলকাতায় একটি গির্জ্জায় আগুন দিয়ে কাগজ-পত্র নষ্ট করেছে। কাল বৃহস্পতিবারে দমদমে গুলী চলেছে, এক জন নিহত, আট জন জখম হয়েছে। হুগলী-হাওড়া-চব্বিশপরগণা-ব্যারাকপুরের সমস্ত মিল বন্ধ ছিল। কলকাতা অপেক্ষাকৃত শান্ত। শুধু জগুবাজারে একখানা লরী পুড়েছে। মিলিটারী এসে গুলী চালায়; কেউ অবশ্য আহত হয় নাই। জগুবাজারে মিলিটারী পিকেট বসেছে।

মুহূর্তে মনের মধ্যে ভেসে ওঠে একটি ছেলে একটি মেয়ের ছবি। দীপ্তি ফুটে ওঠে তার চোখে। তার পর আবার দীর্ঘনিশ্বাসও ফেলে। কাগজখানা পাশে সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

কানু জিজ্ঞাসা করলে--কোথায় যাবেন ?

—এই একটু—একটু দেখে আসি।

কানুও তার সঙ্গে সঙ্গে চলল।

দোকান-পাট বন্ধ। রাস্তা খাঁ-খাঁ করছে। দু-চার জন মানুষ যারা চলছে—তারা মাথা নীচু করে চলছে। শ্যামবাজার বাগবাজারের সংযোগ-স্থলে লাইট-পোষ্টে একটা পোষ্টার ঝুলানো রয়েছে। সাদা কাগজের উপর সবুজ কালীতে হাতে লেখা পোষ্টার—"জনসাধারণের প্রতি নিবেদন"—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু আবেদন জানিয়েছেন—"কলিকাতার অধিবাসীদের আমি কয়েকটি কথা বলিতে চাই। উত্তেজনার কারণ ঘটিলেও শান্ত থাকিতে এবং গভর্ণমেণ্টের সশস্ত্র বাহিনীর সহিত সংঘর্ষে প্রবৃত্ত না হইতে অনুরোধ করিতেছি।"

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত নিবেদন করেছেন—"হিংসার পথে কোন মর্ম্মান্তিক এবং ব্যর্থ পরিণতিতে অবশ্যম্ভাবিরূপে পৌঁছিতে হয়—কলিকাতার অধিবাসীদের কাছে এ সত্য কয়েক দিনের মধ্যে পরিষ্কার এবং স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আগুনের আক্রমণ আগুন জালিয়া রোধ করা যায় না, আগুনের সহিত যুদ্ধ করিতে হইলে জল ঢালিয়া যুদ্ধ করিতে হইবে। সশস্ত্র আক্রমণ প্রতিরোধের একমাত্র উপায় অহিংস প্রতিরোধ।··· অনর্থক খণ্ড আন্দোলনে শক্তি ক্ষয়ে মূল স্বাধীনতা-আন্দোলনের গতি ব্যাহত হইবে।"

আর পড়তে পারলে না গোপেন। সে সরে এসে দাঁড়াল ফুটপাথের উপর। হে ভগবান্! তার সামনে দিয়ে সশব্দে চলে গেল মিলিটারী লরী।

—বাড়ী যান আপনি।

—কে?—পিছন ফেরে গোপেন।

কানু বললে—আমি।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস আপনি বেরিয়ে এল গোপেনের বুক থেকে। কানুর সঙ্গে নেবুর একটা প্রীতির সম্বন্ধ ছিল। মধ্যে মধ্যে ইদানীং গোপেনের সন্দেহ হ'ত—অহেতুক সন্দেহ নয়—তির্য্যক্ কটাক্ষে কানুর দিকে চেয়ে নেবুকে সে হাসতে দেখেছে। কানুর উপর রাগ হ'ত তাঁর। কাল রাত্রে একবার সন্দেহও হয়েছিল কানুর উপর।

—তুমি? তুমি কোথায় যাবে?

—ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্ত দিতে যাব। উণ্ডেডদের জন্য অনেক রক্ত দরকার।

—চল, আমিও যাব।

—না। আপনি নিজেই জখম হয়েছেন। তা ছাড়া কালই ট্রাম-বাস খুলবে বোধ হয়। আপিস যেতে হবে তো।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল গোপেন। কালই ট্রাম-বাস খুলবে। আপিস যেতে হবে। হবে বই কি। না গেলে? না গেলে চাকরী চলে যাবে। কেমন যেন ফ্যাকাসে মড়ার মত চেহারা হয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর। মাথা হেঁট করে সে ফিরে এল। পথে দোকানে চা খাবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু চায়ের দোকানও বন্ধ সব। কলকাতায় দুধ আসছে না আজ দু-দিন ধ'রে। বাড়ী ফিরে দাওয়ায় বসে সে আবার বিড়ি খেতে লাগল।

এবং সার্ব্বজনীন পরিকল্পনা। সেই আশ্বাসে বুক বেঁধে গোপেন বার হল।

আপিসে তার মাথায় ও পায়ে ব্যাণ্ডেজ দেখে সাহেব ডেকেছিলেন! গোপেন সেই শান্তির রচনা করা মিথ্যা কৈফিয়ৎই দিলে। তা ছাড়া আর কি বলবে। অদ্ভুত ভাগ্য গোপেনের। তাকে সাহেব এক সপ্তাহের ছুটী দিলেন। আর দিলেন নিজে থেকে কুড়ি টাকা চিকিৎসার জন্য সাহায্য।

গোপেন আপিস থেকে বেরিয়ে মাঠে গিয়ে বসে রইল সারা দিন। উদাস দৃষ্টিতে দূরে কলকাতার মাথার উপরে যেখানে ইডেন গার্ডেনের গাছের মাথার কোলে—বড় বড় বাড়ীর আকাশ এসে নেমেছে—সেই দিকে চেয়ে বসে রইল। শীতের শেষ, গাছ থেকে পাতা খসে পড়েছে—কতগুলো ঝরা পাতার উপরেই সে বসেছিল। মাথার উপরের গাছটার ডালে নূতন কচি পাতা দেখা দিয়েছে স্তবকে স্তবকে।

হঠাৎ এক সময় তার চোখে পড়ল একখানা বাসের মধ্যে যাচ্ছে সেই মেয়েটি। সেই রহস্যময়ী মেয়েটি—হ্যাঁ, সেই! ভর্ত্তি দুপুরের বাস, লোকজন বিশেষ নাই, সামনের সিটে বসে আছে সেই—সেই মেয়ে। তার পাশে ও কে? কানু? হ্যাঁ—কানুই তো! কানু জুটল কি ক'রে? দুজনে কথা বলতে বলতে চলেছে। কানুর মুখের চেহারাটা পর্য্যন্ত পাল্টে গিয়েছে, যেন—মেয়েটির মুখের দীপ্তির আভা পড়েছে মনে হচ্ছে। ওঃ, বুঝতে পেরেছে গোপেন। কানু ওদের দলে ভিড়ে গিয়েছে—কোন রকমে। হঠাৎ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সে। তার জীবনে আর হল না, সময় নাই। বুড়ো বয়সে তার আর সময় নাই। এক মুঠো ঝরা পাতা মড় মড়

করে ভেঙে ফেললে সে। হঠাৎ মনে হল, সে এই ছেঁড়া ঝরা পাতার মতই পড়ে রইল। হে ভগবান!

নাঃ। দুঃখ সে করবে না। নতুন কচি কাম্বুর দল—তোদের বেষ্টনীর মধ্যে ফুল ফুটুক, ফল ধরুক। সে ঝরা পাতা! গলে পচে সার হয়ে তোদের পুষ্টি জোগাতে যেন পারে এইটুকু ভাগ্য ছাড়া আজ ভগবানের কাছে তার আর কিছুই চাইবার নাই। আর কি চাইবে সে? অনেকক্ষণ আরও বসে রইল, তার পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠল সে। কুড়িটা টাকা পকেটে আছে। দেবা ট্যাবা যে ঘড়ি দুটো এনেছে—সে দুটোকেও বেচে ফেলবে আজ! তাতেও কিছু হবে। এই তার নেবুর দাম। হঠাৎ তার মন তাকে ছি-ছি করে উঠল—কাপুরুষ—মিথ্যাবাদী। সে মাথা নেড়ে উঠল সজোরে—না—না—না।

মিথ্যাবাদী সে হয়েছে—কিন্তু না—কাপুরুষ সে নয়। কখনও নয়। না—না—না। যদি আবার কখনও দিন পায় তো সে তা প্রাণ দিয়ে প্রমাণ করবে।

লম্বা-লম্বা পা ফেলে সে চলতে লাগল। নেবুর একটা শ্রাদ্ধ করতে হবে। গোপনে—অত্যন্ত গোপনে। কালীঘাটে গিয়ে ক'রে আসবে। তার আত্মার শান্তি চাই—সদ্গতি চাই।

—আঃ, নেবু! নেবু রে! মা!
